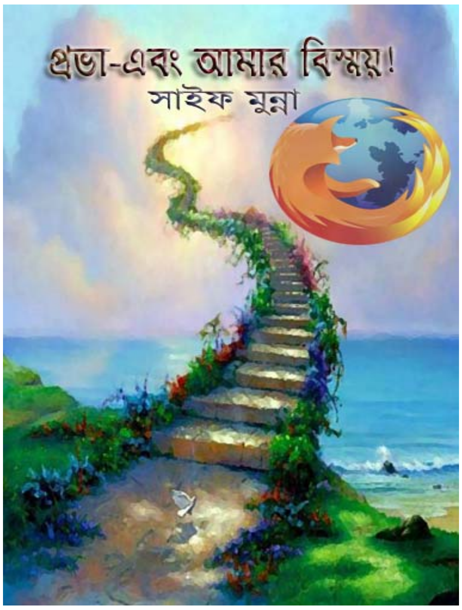

রহস্যময় জগৎ এর বাসিন্দা হয়ে অলিক স্বপ্নে বিভোর। আলেয়াকে আলো ভেবে মিথ্যে মরিচিকার পেছনে অযথা ছুটো-ছুটি। প্রবাহমান জীবনের ছন্দ পতন। ..সাইফ মুন্না।। বাঙালির বিজয়ের মাস ডিসেম্বর ২০০৮ইং

ডিজিটাল টেকনোলজির এই যুগে ঘটছে কতইনা আজব ঘটনা। এই টেকনোলজি দুনিয়াটাকে মানুষের হাতের নাগালে এনে দিয়েছে। নিত্য নতুন আবিষ্কার বিস্ময় সৃষ্টি করছে। এ সমস্ত আবিষ্কার যেমন মানুষের মঙ্গল বয়ে আনছে, তেমনি অমঙ্গলও কম নয়। বর্তমান টেকনোলজির মধ্যে ইন্টারনেট একটা বিস্ময়, তার চাইতেও বিস্ময়কর ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি দ্রুত সময়ে যোগাযোগের বিষয়টি। ইন্টারনেট মেইল বা ইন্টারনেট চ্যাটিং এর মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যমটা হয়েছে অনেক শক্তিশালি এবং দ্রুততর।

আমি **মারুফ,** দীর্ঘ দিন থেকে আছি প্রবাসে, আমার এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে দেখেছি কত উত্থান-পতন। দেখেছি হতবাক করে দেওয়া কত ঘটনা। কত বার বিস্মিত হয়েছি তার কোন ইয়াত্তা নেই। দেখেছি কত প্রতিকূলতা। দেখেছি কত হাসি, কান্না, হতাশা আর হা-হা-কার। দেখেছি প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবন যাত্রা। দেখেছি তাদের আবেগ, অনুভূতি আর ভালোবাসা। দেখেছি কিভাবে তারা তারুন্যকে জলাঞ্জলী দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সংগ্রাম করছে জীবনের সঙ্গে। এ সংগ্রামে কেউ জয়ী হচ্ছে, আর কেউ পরাজয়, কেউবা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে দুর্নিবার গতিতে। অনেকে জানেনা তাদের গন্তব্য কোথায়। নেই কোন পরিকল্পনা, নেই কোন ক্লান্তি। অক্লান্ত, নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। শ্রম হিসেবে শ্রমের মুল্য নেই। তার পরও নেই কোন অভিযোগ, আছে শুধু হা-হুতাশ আর দুঃখ। এ দুঃখ ইনসাফ না পাওয়ার দুঃখ। এখানে ইনসাফ খোঁজা পাঘলামীর নামান্তর। দুনিয়াটা কেমন জানি স্বার্থপর হয়ে গেছে। মানবতার কল্যানের কথা বলে করছে লুটতরাজ। চারদিকে আছে লুটেরাদের কালো থাবা। মুখে সৃষ্টি কর্তার নাম নিলেও অন্তরে তার ভয় নেই। স্বার্থপরের মত সবাই যার-যার সুখ চিন্তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ইনসাফের কথায় রক্ত চক্ষু নিক্ষিপ্ত হয়। কবি বলেছিলেনঃ

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসেনাই কেহ অবনীপরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কবির এ কথাকে আজ বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাচ্ছে বর্তমান বিশ্বসমাজ। এই পৃথিবীতে এখন সবাই নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পছন্দ করে বেশি। সব মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এখন আর কেউ কাউকে উদ্ধারের চিন্তা করা থেকে পতিত করার চিন্তা বেশি করছে। আমরা প্রবাসীরা পতিত হচ্ছি বেশি। এখানে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা প্রত্যেকটা মুহূর্ত কোননা কোন ভাবে আমরা হচ্ছি বিপদ গ্রস্থ।

আমার এক লেখক বন্ধু প্রবাস কে নিয়ে লিখেছেন তাঁর মনের সারভূতঃ

প্রবাস...!!

প্রবাস..মানেই টাকা নয়
জীবন গড়ার শিক্ষা,
প্রবাস..মানেই উল্লাস নয়
অনুপম এক দীক্ষা।।
প্রবাস..মানেই হাসি নয়
কষ্টে চোখের জল,
প্রবাস..মানেই ভাঙ্গা বুকে
জীবন গড়ার বল।।
প্রবাস..মানেই প্রিয়তমার
একটি রঙ্গিন চিঠি,
প্রবাস..হল মানুষের প্রতি
ভালোবাসার সম্প্রীতি।।
প্রবাস..হল স্বপ্ন পুরণ
ছোট ছোট আশা,
প্রবাস..হল ভাইয়ের হাসি
বোনের ভালবাসা।।
প্রবাস..হল বাবার বুকে
সুখের শিহরন,

প্রবাস..হল মায়ের মুখে
হাসির আবরন।।
প্রবাস..হল স্বদেশ থেকে
একটি দুঃখের খরব,
প্রবাস..হল টাকার জন্য
প্রেমকে দেয়া কবর।।
প্রবাস..হল মনের মানুষ
অন্যের ঘরে যাওয়া,
প্রবাস..হল স্মৃতি স্মরন
হাজার কষ্ট পাওয়া।।

এখান থেকে বাংলাদেশে আমাদের যোগাযোগটা মাত্র ক'বছর আগেও হত চিঠি পত্রের মাধ্যমে, যার কারনে অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতে হত মা-বাবা, আত্মীয় স্ব-জনের খোঁজ খরব নিতে। কিছু সময় পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুব দ্রুত যোগাযোগ করা যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। মোবাইল টেকনোলজীর যুগান্তকারী সাফল্যের প্রথম দিকে কল রেট বেশি থাকার কারণে তখন আমরা হিসেব করে প্রয়োজনীয় কথা সেরে ফোন রেখে দিয়েছি। তখন আমাদের চোখ থাকত মোবাইল ডিসপ্লের (স্ক্রিনের) দিকে, কারণ, কলরেট বেশি, আর তাই নির্দিষ্ট সময় কথা বলে লাইন কেটে দিতে হবে। এখন এই মোবাইলের কল রেট কমানোর জন্য উদ্ভব হল আরেক বিস্ময়কর টেকনোলজী যার নাম দিয়েছে, ভি. ও. আই. পি. (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল)। যার মাধ্যমে মোবাইল কল রেটকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে এখন প্রয়োজনের চাইতে অপ্রোয়োজনীয় কথা হচ্ছে বেশি। এখন তরুন প্রজন্ম আর মোবাইল ডিসপ্লের (স্ক্রিনের) দিকে তাকিয়ে থাকেনা! তাকিয়ে থাকে কতক্ষনে মোবাইলের ব্যাটারী ডাউন হবে! বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই কারো।

চিন্তা শক্তিটাকে একটু প্রখর করে চিন্তা করলে কম বেশি সবাইকে বিস্মিত হতে হবে। যুগের সাথে টেকনোলজীর যেমন পরিবর্তন হয়েছে ঠিক তেমনী ভাবে পরিবর্তন হয়েছে তারুন্যের চিন্তা-ভাবনা। তারুন্যের এই অভাবনীয় পরিবর্তন কতটুকু ভাল, কতটুকু মন্দ তা তলিয়ে দেখার সময় কারো নেই। এতবড় পরিবর্তন দেখে সবাই যেন হতবাক, নির্বিকার না মহাখুশি তাও বোঝা যাচ্ছেনা। যুগের সাথে পরিবর্তন আসবে সব কিছুতে এটা স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন, ঋতু পরিবর্তনের সাথে-সাথে পরিবর্তন হয় প্রকৃতির। পরিবর্তনটা হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মে, যুগ-যুগ ধরে এ পরিবর্তনে কারো কোন অভিযোগ নেই বা ছিলনা। অবশ্য এখানে অভিযোগ থাকার কথাওনা। কারণ, এই বিশ্ব জাহানের যিনি মালিক তিনি স্বয়ং এ পরিবর্তন সাধন করছেন। এ পরিবর্তনের সাথে তারুন্যের পরিবর্তনে আছে স্বল্প-বিস্তর ব্যাবধান। ঋতু বা প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে, যা নিয়ে আমরা মাতা-মাতি করে থাকি। যেমন: ফাল্গুন, বৈশাখ, বসন্তকে আমরা বরণ করে নেই পুরো দেশকে মাতিয়ে। যত দিন যাচ্ছে তত তার চাকচৈক্য ও বৈচিত্রতা বাড়ছে। আগের রূপ হারিয়ে নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে সব কিছু।

ডিজিটাল টেকনোলজির যুগে মনে হচ্ছে আমরা কতইনা পিছিয়ে আছি। অদক্ষ জনশক্তি, অসুস্থ রাজনীতি, অস্থিতিশীল পরিবেশ, রুগ্ন অর্থনীতি, সর্ব ক্ষেত্রে চরম অ-ব্যবস্থাপনা সব কিছু মিলিয়ে টেকনোলজি থেকে আমরা পড়ে আছি অনেক দূরে। কম বেশি সব টেকনোলজি আমরা পাচ্ছি, তবে তখন পাচ্ছি, যখন এর ব্যবহার হ্রাস পেয়ে নতুন সংস্করন বাজারে আসছে। ল্যান্ডফোন সুবিধা আমারদের দেশে যা আছে তুলনা মুলক লজ্জাস্কর ব্যাপার। মোবাইল ফোন টেকনোলজীর প্রভাবের কারণে তা আর প্রসারতা পাবেনা সহজে অনুমান করে বলা যায়। ল্যান্ডফোন যদি প্রসারতা না পায় তাহলে টেকনোলজির আরেক বিস্ময়, ইন্টারনেট ব্যাবহারের সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে আমাদেরকে। এখনো ল্যান্ডফোনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত আছে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ। খুব সহজে এ থেকে উত্তোরনের পথও তেমন সুগম নয়। তবে সর্বমহলের আন্তরিকতা থাকলে আমাদের অসম্ভব কিছু নয়। ইন্টারনেট একটি তথ্য ও প্রযুক্তিগত সুবিধা বহন করে। যার রয়েছে অনেক গুনাবলী এবং কাজ। এই ইন্টারনেট এখন আমাদের দেশে ব্যাবহার হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠির কাছে। আমাদের দেশে ইন্টারনেটের প্রসারতা বৃদ্ধিতে সময় লাগবে অনেক, তা হলফ করে বলা যায়। তবে আমাদের দেশের আইটি সেক্টরের দিন-দিন যে সফলতা দেখা যাচ্ছে তাতে আবার খানিকটা আশার সঞ্চার হয়। হয়তঃ আমরাও পারব দেশের জনসংখ্যার মোটামোটি একটা অংশকে এর আওতায় আনতে।

দুনিয়াটা একটা বিস্ময়! এখানে প্রতিনিয়ত কোন না কোন ভাবে সবাই বিস্মিত হচ্ছে। একটা নতুন দিন মানে অপেক্ষা করছে একটা নতুন বিস্ময়! আর এই দুনিয়াতে বেশি বিস্মিত হতে হয়েছে নারীকে নিয়ে। এ নারীকে নিয়ে বিস্ময়ের যেমন শেষ নেই, তেমনি লেখারও শেষ নেই। কতজন লিখেছেন কবি বা সাহিত্যিক হয়ে, আবার কতজন লিখেছেন দার্শনিক এবং সন্ন্যাসী হয়ে। সমাজে নারীর অনেক রূপ, কখনো মমতাময়ী মা, কখনো আদরের এবং শ্রদ্ধাভাজন বোন, কখনো পরমা সুন্দরী স্ত্রী, কখনো প্রেয়সী, কখনো সুখের সংসারে পঁচন ধরানো এক রাক্ষসী।
একজন বরেণ্য কবি লিখেছেন-

ওগো নারী তুমি শ্রেষ্ট সৃষ্টি অবণীর
গোলাপে গঠিত যেন ভিতর বাহির,
মাঝে-মাঝে স্ব-বিস্ময়ে তাই মনে হয়
তুমিতো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নও!

আরেকজন লিখেছেন-

নারীর মন, আকাশের রং
খোদ বিধাতার ও জানা নেই।

এভাবে আরো কত লেখা আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে। যারা লিখেছেন তাঁরা তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে উজ্জল। তাঁরা তাঁদের চিন্তা-চেতনা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সত্যটুকু অনুধাবণ করেছেন। যা তাঁদের কলমের মাধ্যমে উঠে এসেছে জনসম্মুখে।

ইন্টারনেট ব্রাউজিং বা ইন্টারনেট চ্যাটিং এ দু'টা জিনিস ক্রমেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে উন্নত বিশ্বে। এখন প্রায় সব কিছুই হচ্ছে এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে-স্বাদির মত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়টিও এর আওতায় এসেছে অনেক আগে এবং যেভাবে এসেছে তাও আরেকটা বিস্ময়। বিস্ময় বলছি এ কারনে যে, ভিন্ন জাতি-গোষ্টি এবং দেশ-দেশান্তর থেকে প্রথমে নেট চ্যাটিং, মেইল আদান-প্রদান, ছবি আদান-প্রদান, সর্বোপরি অসম্ভব ভালোলাগা আর ভালোবাসার মাধ্যমে শুভপরিনয়ে জড়াচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। ইন্টারনেট চ্যাটিং

অনেকটা এ্যালকোহল জাতীয় জিনিস। চ্যাটের মাদকতা এ্যালকোহলের চাইতে কোন অংশে কম নয়। যারা এটার সাথে পরিচিত তারা অন্তত আমার এ কথাকে সমর্থন করবেন একশত ভাগ।

প্রবাসে আপন কর্মসংস্থানে দু'হাজার দুই সালের দিকে প্রথম পরিচিত হই বিস্ময়কর এই ইন্টারনেটের সঙ্গে। প্রথম দিকে ব্যাবহার জানলেও বিভিন্ন কারনে তা ব্যাবহারের সুযোগ ছিল অপ্রতুল। তার মধ্যে বড় কারন হচ্ছে অফিসিয়াল সমস্যা। তখন সরাসরি ইন্টারনেট ব্যাবহার করা অফিসের বড় কর্তার চোখে ভাল দেখাতনা। সময়ের পরিবর্তনে এবং ইন্টারনেটের সহজ লভ্যতার কারণে ব্যাবহারের সুযোগ-সুবিধাটাও বেড়ে যায়। আর এখন অবাধে ব্যাবহার হচ্ছে ইন্টারনেট। এখন আর এটা লুকোচুরির বিষয় নয়, এখন চাকুরীর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, আগে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর অভিজ্ঞতা আছে কিনা। কারণ, এটা এখন গ্লোবালাইজেশন এবং কর্পোরেট দুনিয়ার জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে।

উন্নত বিশ্বে ইন্টারনেট ছাড়া মনে হয় সব কিছু একরকম অচল। উন্নত দেশ গুলোতে অনেক ক্ষেত্রে সরকার ইন্টারনেট ব্যাবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে খুব সহজভাবে। টেলিফোনের ল্যান্ডফোন সংযোগের সাথে ফ্রি ভাবে দিচ্ছে ইন্টারনেট সুবিধা। আর এ সুবিধাটা এখানে আমরাও পাচ্ছি। এখানে ইন্টারনেটের অবাধ ব্যাবহারের কারনে প্রায় সময় সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়ি ইয়াহো মেসেঞ্জারে বা অনলাইন আড্ডায়। এই ইয়াহো মেসেঞ্জার বা অনলাইন আড্ডা আর একটা বিস্ময়! ইন্টারনেট টেকনোলজি যে কি, ইয়াহো মেসেঞ্জারে তার প্রমান মেলে। যদিও রাইটস ভাতৃদ্বয়ের উড়োজাহাজ, আলেক জান্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোন আবিষ্কার, যার সফল এবং যুগান্তকারী সংস্করন আজকের মোবাইল টেকনোলজি, এবং কালের আবর্তনে হাজারো টেকনোলজি আজ চোখের সামনে। গত দু'বছর আগেও যা কল্পনার বাইরে ছিল, চিন্তা করা যায়নি, মাত্র দু'বছর পরে তা বাস্তবতা।

প্রথম দিকে ইয়াহো মেসেঞ্জারে চ্যাটিং ছিল শুধু মাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে। পরে ধীরে-ধীরে যখন এর মাদকতা ভর করে শরীরে, তখন থেকে অফিস সময়ের পরেও বসে ছিলাম কতদিন তার কোন ইয়াত্তা নেই। এখানে একটা জিনিস পরিলক্ষিত যে বিপরীত লিঙ্গের কেউ না থাকলে চ্যাট রুম রসকষ হীন হয়ে পড়ে। তবে, দু'হাজর দু' সাল থেকে শুরু করে দু'হাজার ছয় সালের প্রথম দু'তিন মাস পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আমার সাথে নেটে কোন মেয়ের সাথে পরিচয় কিংবা কোন মেয়ের সাথে চ্যাটিং হয়নি। আবার দু'হাজর দু' সাল থেকে দু'হাজর চার সাল পর্যন্ত যদিও ইন্টারনেটের এ্যালকোহলটা বেশি ছিল, কিন্তু পরক্ষনে তা ধীরে-ধীরে অনেক কমে যায়, আর এভাবে কমতে-কমতে প্রায় এক বছর ইন্টারনেটের দিকে তেমন একটা ঝোঁক ছিলনা।

এর পর দু'হাজর ছয় সাল থেকে আবার একটু-একটু করে নেটে বসতে থাকি। এর মধ্যে দু'জন ভাল বন্ধু আমি জোগাড় করে নিলাম, যদিও ওরা ছিল অনেক জুনিয়র কিন্তু দু'জনই অনেক ভাল। একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, অন্যজন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া 'ঈমন', দারুন এক ভক্ত আমার। বসে থাকবে কতক্ষনে আমি ইন করি। ওর প্রথম পি. এম. আসবে ভাইয়া তুমি কেমন আছ? আমি অনেক্ষন বসে আছি তোমার অপেক্ষায়! এর পর থেকে শুরু হয় ওর প্রশ্নের পালা। এটা এমন কেন? অন্যভাবে হলে সমস্যা কি? ইত্যাদি-ইত্যাদি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিয়েল' প্রেম-রোমান্স নিয়ে আলাপ করতেই বেশি পছন্দ করে। চিঠি পত্রের যুগের প্রেম এবং বর্তমান সময়ে ই-মেইল, ফোন কল কিংবা এস.এম. এসের যুগের প্রেমের প্রার্থক্য এবং এর মজার দিকগুলো নিয়ে কথা বলে বেশি। ইদানিং এদের সাথে দেশ-বিদেশের অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে ভালই চলতে থাকল আমার।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ইয়াহো মেসেঞ্জারে "প্রভা" নামটা দেখে ক্লিক করলাম। হ্যায়, হ্যালোতে ভালোই সাড়া পাওয়া গেল। কিন্তু বোঝা গেলনা ছেলে না মেয়ে। জিজ্ঞেস করাতে বলল, মেয়ে। তারপরও বিশ্বাস হলোনা, এই বিশ্বাস না হওয়ার কারণ, এখানে যারা আসে তারা অনেকেই নিজের নামটাকে হাইড করে আসে। সাধারণতঃ নিজের পছন্দের একটা নিক নেম নিয়ে আসে। এই নিক নেমের অন্তরালে থাকে কখনো ছেলে কখনো মেয়ে। নিজ থেকে অবস্থান পরিষ্কার না করলে বোঝার কোন উপায় নেই কে কার সাথে পি. এম. করছে। যেমন, কিছু নিক নেম এরকমঃ ধ্রুবতারা, নাইস বিডি, একাকী, তুমি হীনা, নীল আকাশ ইত্যাদি। এ সমস্ত নিক নেম গুলো দেখে বোঝার উপায় নেই এই নিক নেমের অন্তরালে কারা আছে চ্যাট রুমে। ওর কাছে জানতে চাইলাম কিভাবে বিশ্বাস করব তুমি ছেলে না মেয়ে। "প্রভা" বলল, তুমি তোমার উপর বিশ্বাস রাখ, তাহলে আমাকেও বিশ্বাস করতে পারব। আমি ওর কথায় আশ্বস্ত হলাম অনেকটা। কারণ, ওর কথাতে জোর ছিল, মনের জোর। আমি ওকে বললাম ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। ও খুশি হয়ে ধন্যবাদ দিল। অনেকক্ষন এটা ওটা বলে ঐদিনের মত শেষ করি আমরা। ঐদিন "প্রভা" বলেছিল পরের দিন ঠিক এই সময়ে আমি যেন ওর জন্য নেটে অপেক্ষা করি।

পরের দিন সময় ঠিক করে আমি আবার ওর জন্য নেটে অপেক্ষা করতে থাকি নেটে। কিছুক্ষনের মধ্যে পি. এম. এল কেমন আছ তুমি? রাগ করোনা আমার একটু দেরী হয়ে গেছে।,সৌজন্যতা বজায় রাখার জন্য বললাম না ঠিক আছে সমস্যা নেই। খুশি হল "প্রভা" দ্বিতীয় দিন চ্যাটিংয়ের শেষ সময়ে আমি ওর সেল নাম্বার চাইলাম, সাথে-সাথে ওর সেল নাম্বার দিল ০১৮১৭৪... এবং বলে দিল কোন- সময়ে ফোন করলে সবছে ভাল হবে, ও ফ্রি ভাবে কথা বলতে পারবে। দু'জনে নাম্বার বিনিময় করে উঠে গেলাম। আর এভাবেই নেটে প্রথম কোন মেয়ের সাথে আমার পরিচয়। আমার জান, মানে "প্রভা" থাকে বাংলাদেশে। ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল সাতই ফেব্রুয়ারী দু'হাজার ছয় সালে।
দ্বিতীয় দিনে চ্যাটিংয়ের কিছু অংশ:

– কেমন আছ তুমি?
– আমি ভাল, তুমি কেমন আছ?
– আমিও ভাল। রাগ করোনা আমার একটু দেরী হয়ে গেছে।
– না, ঠিক আছে সমস্যা নেই।
– কেমন চলছে তোমার?
– যেমন চলার তেমন চলছে।
– কেমন চলার, কেমন চলছে।

– এই কোন রকম ভাল চলছে।
– কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার, এমন ভাবে কথা বলছ কেন?
– নাতো, কিছুই হয়নি। এমনি।
– না, কিছুতো একটা সমস্যা আছে!
– না-না কোন সমস্যা নেই। আচ্ছা তুমি কি করছ? মানে পড়া লেখা?
– না, আমারতো পড়া লেখা মোটা-মোটি শেষ। আমি এখন জব করছি।
– ওয়াও! দারুন।
– ধন্যবাদ।
– বিয়ে করেছ?
– না এখনো করিনি।
– কেন? বিয়ে করনি কেন?
– মনের মত কাউকে পাইনি তাই করিনি। শোন, আমি আমার জন্য একজন লাইফ পার্টনার খুঁজছি।
– আচ্ছা! আমি দেখব?
– কোথায়? বিদেশে?
– হু, এখানে অনেক ভাল ছেলে পাওয়া যাবে। অনেক সুদর্শন।
– না-না! ওখানে আর দেখতে হবেনা। পাঘল ছেলে!
– হা-হা-হা
– তুমি হাসছ কেন?
– না এমনিতে, তুমি যে পাঘল ছেলে বললে।
– পাঘল বলবনাতো কি বলব!
– বল, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমাদের রিলেশানটা কি হবে?
– আমি কি জানি, তুমিই বল।
– ফ্রেন্ডশীফ!
– তুমি যা ভাল মনে কর।
– আমিতো এতেই ভালো মনে করি।
– ওকে, ফ্রেন্ডস। আচ্ছা, কথা দাও প্রতিদিন মেইল করবা।
– ঠিক আছে কথা দিলাম, প্রতিদিন না হলেও মেইল করব।
– না-না, প্রতিদিন একটা করে মেইল করবে বল।
– আচ্ছা, ঠিক আছে করব, কিন্তু, তুমিও করবে।
– হু, তোমার মেইল পেলে আমিও মেইল করব। আমারনা, মেইল চেক করতে এবং পড়তে খুব ভালো লাগে।
– আচ্ছা, আমি তোমাকে এত মেইল করব যা পড়তে-পড়তে আর চেক করতে-করতে তুমি পাঘল হবে।
– আচ্ছা, হলে হব, তারপরও তুমি মেইল করবে। আচ্ছা, তুমি এখন কোথায়?
– কেন? অফিসে।
– আর কতক্ষন থাকবে?
– ডিউটি শেষ হওয়া পর্যন্ত।
– কেন, তোমার ডিউটি শেষ হয়নি?
– আরে নাহ, আরো দু'ঘন্টা বাকী আছে।
– তোমার ওখানে এখন কটা বাজে?
– সব সময় তোমার সময় থেকে তিন ঘন্টা কম হিসেব করবে।
– ও তাই? তার মানে আমার এখানে এখন ছয়টা, আর তোমার ওখানে এখন তিনটা। তাইনা?
– হু, তাই।
– দেখ, সময়ের ব্যবধান সমস্যা হবেনাতো?
– আরে নাহ্ সমস্যা হবে কেন?
– নাহ্ বলছিযে, আমি যখন নেটে বসতে পারব তুমি তখন পারবেতো?
– কেন পারবনা?
– পারলেতো ভাল।
– তুমি নেটে বসলে আমাকে একটা মিসকল দিও। আমি বুঝে নিব তুমি নেটে আছ।
– আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যখন থাকব তোমাকে মিসকল নয়, কল দিব। আজ তাহলে উঠি? ভাল থাকবে তুমি।
– আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও উঠব। তুমিও ভাল থেকো। আল্লাহ হাফেজ
– বাই, আল্লাহ হাফেজ।

"প্রভা"র সাথে দ্বিতীয় দিন এখানেই শেষ। এই প্রথম সুখের এক অনুভূতি নিয়ে চ্যাট রুম থেকে বের হলাম। অসম্ভব এক সুখের এবং ভালোলাগার অনুভূতি। যা শুধু উপলব্ধি করা যায়।

"প্রভা"ই প্রথম আমাকে ফোন করে বাংলাদেশ থেকে! "প্রভা"র ফোন পেয়ে আমিতো আনন্দে মাতোয়ারা। কারণ, ওর কণ্ঠটা এতই মিষ্টি ছিল যা মনের সম্পুর্ন ভাব দিয়েও বোঝানো কষ্ট সাধ্য হবে। "প্রভা"র প্রথম কথাটি ছিল কেমন আছ তুমি? আমি কিছুক্ষন কিছু বলতে পারলাম না, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি শুধু জবাব দিয়ে যাচ্ছি, কিছু বলব, কিছুক্ষনের জন্য আমার সে অনুভূতি লোপ পেয়েছিল। ওর কণ্ঠে ছিল এক যাদু, এক আকর্ষক, যা চুম্বকের সমমেরুর চাইতেও প্রবল। চার-পাঁচ মিনিট কথা হল, আমি শুধু শুনেছি আর উত্তর

দিয়েছি নিজে কিছু বলতে পারলাম না। "প্রভা" বাই বলে লাইন কেটে দেওয়ার পর চিন্তা করতে থাকলাম অনেকক্ষন ধরে, বিশ্বাস হচ্ছিলনা আসলেই "প্রভা" আমাকে ফোন করেছিল। তড়িৎ গতিতে মোবাইল ওপেন করে রিসিভ কলে দেখলাম রিসিভ কলে লাষ্ট নাম্বারটা ওরই ছিল। আসলেই ও আমাকে ফোন করেছিল। পরে চিন্তা করতে থাকলাম ও আমাকে কি বলেছিল, আর আমি ওকে কি বলেছিলাম। নাহ্ দু'একটা কথা ছাড়া আর কিছুই মনে রইলনা। হা-হুতাশ করতে থাকলাম, যদি ওর কথাগুলো আবার শুনতে পেতাম! অনেকটা ঘোরের মধ্যে কাটল দিনটা। অনেক গুলো ভুল করেছিলাম এদিন অফিসে। এ্যারাবিয়ান বস ব্যাপারটা টের পেয়ে জিজ্ঞেস করল যে, আমার কোন সমস্য আছে কিনা, আমি না বলে কোন রকমে পাশ কাটালাম বসকে। কিন্তু, আমি কোন ভাবে সহজ হতে পারছিলাম না। কোন রকমে অফিস আওয়ার শেষ করে বাসায় গেলাম। খেতে বসলাম, খেতে পারলামনা। এমন অবস্থা আগে কখনো হয়েছে বলে আমার মনে পড়েনা। বুঝতে চাইলাম কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু না, আজ নিজেকে নিজের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

এর মধ্যে কাজের চাপের কারণে দু'তিন দিন আর নেটে বসতে পারলামনা। চতুর্থ দিন অফিস আওয়ারের পরে নেট ওপেন করে "প্রভা"র অফ লাইন মেসেজ পেলাম। দেখলাম রেগে আছে "প্রভা" কেন আমি নেটে বসলাম না, কেন ফোন বা এস. এম. এস. করলাম না ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমি ওকে অফ লাইন মেসেজ দিয়ে গেলাম আগামী কাল বসব তুমি থেকো।পরের দিন নেট ওপেন করতেই পি এম করল "প্রভা"

– না আমি তোমার সাথে কথা বলবনা,
– কথা না বললে নেটে এসেছ কেন?
– আমি আমার কাজে নেটে এসেছি তাতে তোমার কি?
– তুমি আমার কথা শোন, পরে যা খুশি তা বলো।
– (রাগটা একটু কমিয়ে) যা বলবে তাড়াতাড়ী বল।

আমি আমার সমস্যার কথা বললাম। শোনার পর সরি বলে হেসেছিল "প্রভা"। আমার মনে হল বুকের উপর থেকে পাথর সরে গেছে। পি এমের এক পর্যায়ে ও পিসি টু পিসি কল করে বসলো। আমি কল ধরলাম। কল ধরার পর বলল যে, আমি যেন কথা বলি। সে আমার কথা শুনতে পারবে কিন্তু বলতে পারবে না। কারণ, কথা বলার জন্য যে মাইকক্রোফোন লাগে সেটা তার ছিলো না। আমি তো রেগে অস্থির। অনেক রাগ করেছিলাম আমার "প্রভার" ওপর। পরে আমি লাইন কেটে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষনের মধ্যে অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে ওর সাথে আবার ভালভাবে পি. এম. করতে থাকি।

এটা-সেটা নানান কথার ফাঁকে ও আমাকে বলে তার একজন লাইফ পার্টনার দরকার। ওকে বলেছি ঠিক আছে তুমিও খোঁজ, আমিও খুঁজছি দেখি পাই কিনা। এখানে অনেক স্মার্ট এবং সুদর্শন ছেলে আছে, দেখি এদের মধ্য থেকে তোমার জন্য কাউকে মিলিয়ে দিতে পারি কিনা। "প্রভা" আমার এ কথা শোনার পর আমাকে বলে বোকা ছেলে, আমি বলি মিষ্টি মেয়ে। দু'জনেই হেসে একাকার। "প্রভা" অসম্ভব ভালো একটা মেয়ে, তবে খুবই চাপা স্বভাবের। ফোনে কথা বলতো খুব কম। যা বলত, আমার মন চাইত শুধু মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনতে। ওর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে মন চাইত। যখন তখন ওকে ফোন করতে মন চাইত। কিন্তু চাইলে কি ফোন করা যায়। এর মধ্যে কতগুলো প্রতিবন্ধকতা ছিল।

ও চাকুরী করত একটা প্রাইভেট ফার্মে, যার জন্য সবসময় যোগাযোগ করা সম্ভব ছিলনা। অফিস চলাকালিন সময়ে অফিসের ঝামেলা, আবার বাসায় ফোন করলেও ঝামেলা, ও চাইতনা যখন ও বাসায় থাকে তখন ওকে ফোন করি। কারন, ওদের ফ্যামিলিটা ছিল খুব রক্ষণশীল। তার পরেও আমরা ফোনে কথা বলেছি। তবে যতনা ফোনে কথা হয়েছে তার চাইতে আমাদের বেশি যোগা-যোগ ছিল ইন্টারনেট মেইলিং এ। আমাদের সম্পর্কটা প্রথমে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। যত দিন যেতে লাগল তত সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত হতে লাগল। আর তখন আমরা চ্যাটিং এর পর্ব থেকে সরে এসে শুধু মেইল এবং ফোনের এর মধ্যে সিমাবন্ধ থাকি। চ্যাটিং থেকে দুরে সরে আসার প্রধান কারন হচ্ছে সময় মেনে চলা, দু'জনে চাকুরী জীবি, কিন্তু দু'জন দু'দেশে হওয়াতে ঝামেলা হত।

"প্রভা"র সাথে পরিচয়ের পর থেকে আমি ভুলে যেতে থাকি আমার প্রবাসের নিঃসঙ্গতা। আমার দিন গুলো কাটতে লাগল এক অসাধারন ভালোলাগার অনুভূতি দিয়ে। আমি ভেসে বেড়াই আমার কল্পনার রাজ্যে। যেখানে শুধুই বিচরন করে "প্রভা"। কেন এমন হচ্ছে নিজেও জানতামনা। শুধু এটুকু জানতাম সময়টা খুব ভালভাবে কাটছে।

ওকে একদিন মেইল করে বলেছিলাম আমার উল্যেখ করার মত কোন বান্ধবী নেই, নেই তেমত কোন বন্ধুও। এর কারণ, দীর্ঘ সময়ের প্রবাস জীবন। আর আমি এমন একটা দেশে থাকি এখানে বন্ধু পাওয়া যত সহজ, ঠিক ততটাই কঠিন একজন বান্ধবী পাওয়া। কারণ, ধর্মীয় অনুশাসনে এখানে আমারা বা আমাদের সমাজটা এক রকম আবদ্ধ। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে পরিবারের সদস্য ছাড়া কারো সাথে তেমন একটা যোগাযোগ নেই। বান্ধবীতো দুরের কথা! আর, একজন বন্ধুর কাছে কোন কিছু শেয়ার করে যতটা সহানুভূতি মেলে তার চাইতে বেশি মেলে একজন বান্ধবীর কাছে। অবশ্য এর একটা থিয়রি আছে, আর তা হল, আমরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষন অনুভব করি বেশি। যার কারণে এখানে ভাবাবেগটাও একটু বেশি। তাছাড়া একটা মেয়ে যত সহজে কোন একটা বিষয়কে মেনে নিতে পারে একটা ছেলে তা পারেনা।

"প্রভা"র প্রত্যেকটা মেইল এবং এস. এম. এস. এ ও আমাকে কখনো হ্যানি, সোনা, বাবু সোনা বলে সম্মোধন করতো, আমি ওকে জানু, জান, জানেমান ইত্যাদি। আমাদের দিন গুলো কাটছিল খুব ভালভাবে। আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করি ভবিষ্যৎকে ভুলে বর্তমানকে নিয়ে কাটাতে। আমাদের মধ্যে আমরা অনেক মিল খুঁজে পেলাম। ওর যা যা পছন্দ, দেখি আমারও ঠিক তাই পছন্দ। এমনও মাঝে মাঝে হয়েছে যে, আমি যা বলতাম সেও একই সময় একই সঙ্গে ওই কথা বলে উঠতো। আমরা হেসে উঠতাম দু'জনে একসাথে। আবার মাঝে-মাঝে এমনও হতো আমি যা চিন্তা করছি দেখা যেত ওই কথাটাই "প্রভা" বলে ফেলতো আর আমি বলে উঠতাম যে, এই, আমি তো এটাই চিন্তা করছি। এখানে আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং মনের মিলটাও আর্শ্চয্য জনক ভাবে একই মনে হত। যত দিন গড়াচ্ছে তত আমরা একজন অন্য জনের কাছে সহজ হতে লাগলাম। আমি ওকে মজা করে কমলা ডাকতাম। "প্রভা" কে যেদিন থেকে এই নামে ডাকলাম আমার জানু অনেক্ষন ধওে হেসেছিল। ও আমাকে বলে আর কোন নাম খুঁজে পেলেনা? আমি মনে করতাম ও এ নামে ডাকলে রাগ করতো। কিন্তু না, ও দারুন খুশি হত। ভুল করে আমি কোনদিন না ডাকলে ও আমাকে মনে করিয়ে দিত, কই তুমি আমাকে আজ কমলা ডাকনি কেন?

“প্রভা”র সবচেয়ে যেটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগতো সেটা হলো ওর হাসি। ও এমন ভাবে হাসে যে শুনে মনে হয় একটা বাচ্চা হাসছে, এক নির্মল এক হাসি উপহার দিত ও আমাকে। আমি ওকে বলতাম তুমি আমার সাথে কথা বলার সময় কারনে-অকারনে হাসবে। ও আমাকে বলে, তখন আমাকে বোকা-বোকা লাগবে, আমি পারবনা। তারপরও আমি বায়না ধরতাম, বলতাম তোমার কাছে আমার এই একটাই চাওয়া আর কিছু নয়। তখন ঠিকই ও কথা বলার সময় বেশি বেশি হাসতো। কথার শেষ পর্যায়ে আমি যখন ওকে স্পেশাল ধন্যবাদ দিতাম, তখন ও জিজ্ঞেস করত কেন স্পেশাল ধন্যবাদ দিলাম। তখন আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হত তোমার অসম্ভব সুন্দর হাসির জন্য।

“প্রভা” আজ ফুল কিনতে গেছে আমার জন্য। কিন্তু সে ওই ফুল আমাকে দিতে পারবে না আমি খুব ভালো করেই জানি, ও নিজেও জানে ফুল কিনে আমাকে দিতে পারবেনা। কারন, আমি আমার জানুর থেকে ছয় হাজার কিলোমিটার দুরে অবস্থান করছি। তারপরও আমি জানি আমার “প্রভা” আমার জন্য ফুল কিনবে। ফোন করে বলবে আমি তোমার জন্য ফুল কিনে তোমার অপেক্ষায় আছি। ঠিক একই কথা মেইল করে বলবে, বলবে তুমি আসনি কেন? আমি রাগ করেছি। আমি তোমার সাথে আর কখনো কথা বলবনা। “প্রভার” এই অভিমানের সুর আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমি ওকে অসম্ভব ভালবাসি! কিন্তু আমি তাকে কোনদিন বলতে পারিনি আমি তোমাকে ভালবাসি! দু'হাজার সাত সালের ভ্যালেন্টাইন ডেতে “প্রভা” কে নিজে ডিজাইন করে একটা গ্রেটিংস কার্ড দিয়েছিলাম। ও খানে লেখা ছিল, “একজন বন্ধুর কাছ থেকে যতটুকু ভালবাসার দরকার তার সবটুকুই দিলাম তোমাকে। ফুলের পাপড়ির মত সুখের পাপড়ি দিয়ে সাজানো থাকুক তোমার জীবন”। আমার জান ভিষন খুশি হয়েছিল। পরের মেইলে তার খুশির ছটা সে প্রকাশ করেছে।

দু'হাজার সাত সালে ১লা ফাল্গুন, ও যাবে রমনার বটমুলে, ছায়ানটে, এবং বাংলা একাডেমীর বই মেলায়। এর আগের দিন আমাকে ফোন করে বলে কাল ১লা ফাল্গুন! তোমার মনে আছে? আমি বললাম আমার মনে চৈত্রের দারুন খরা আমি ফাল্গুনের খবর রাখব কি করে! ও আমাকে বলে তুমি আর কোন দিন এভাবে কথা বলবেনা। কাল সকালে আমি সাদার মধ্যে লাল পাড়ের শাড়ী পরে, সূর্য্যমুখি ফুলের মালা এবং খোঁপায় গোলাপ পরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ও জানে এটা অসম্ভব! তার পরও ওর মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করল। আমার ও মন চায় আমার “প্রভা” কে অন্তত এই বিশেষ দিন গুলোতে সঙ্গ দিতে। কিন্তু সব চাওয়া কি মানুষের পূরণ হয়? ঠিক এমনি ভাবে আমার এই চাওয়াগুলোও পূরণ হয়নি। আমি পারিনি আমার আমার “প্রভা” কে এই বিশেষ দিনগুলোতে সঙ্গ দিতে। পারিনি তার আবদার গুলোকে রক্ষা করতে। পারিনি কাছে থেকে তার অভিমান গুলোতে আলতো ছোঁয়া দিতে।

যত দিন যেতে লাগল তত ওর দুষ্টমিটাও বাড়তে লাগল। ফোন করে বলবে তুমি কি এখন বাসায়?
যদি বলি হ্যাঁ,
আর কেউ নেইতো তোমার সাথে? দেখ তোমার বন্ধু বা তোমার রুমমেট থাকলে সমস্যা নেই, তবে বিপরীত লিঙ্গের কেই থাকলে...। আবার কোনদিন বলবে, দেখ, এই চ্যানেলটা দেখ, খুব সুন্দর নাটক হচ্ছে। গভীর রাতে ফোন করে বলবে কি ঘুমিয়েছো? নাকি কাউকে কল্পনা করছ? যদি বলি ঘুমতো আসছেনা, “প্রভা” বলত এক কাজ কর, মাথার নীচ থেকে একটা বালিশ নিয়ে খুব যত্ন করে বুকের কাছে ধর, এবার ঘুমিয়ে পড়। আমি হেসে একাকার, আর বলতাম ফাজলামো হচ্ছে তাইনা? ও বলতঃ ওমা, তোমার ঘুম আসছেনা তাই আমি তোমাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিলাম, কোথায় ধন্যবাদ দিবে তা না করে বলে আমি ফাজলামো করছি। যদি বলতাম তুমি ঘুমাওনি কেন? চটজলদি জবাব-তোমাকে নিয়ে জেগে-জেগে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখছি, এ কথা বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠত। এভাবে “প্রভা”র রাত জেগে থাকা, গভীর রাতে আমাকে ফোন করা আমাকে প্রায় ভাবাত। আমি প্রবাসে থাকি, এখানের সময়ের সাথে বাংলাদেশের সময়ের প্রার্থক্য তিন ঘন্টা। এ বিস্তর সময়ের প্রার্থক্যের কারণে আমি ওকে রাত্রে ফোন করে তেমন একটা বিরক্ত করতাম না। যদিও জানতাম ও বিরক্ত হবেনা এর পরও আমি রাত্রে তেমন একটা কল দিতামনা।

কিন্তু ও যা করছে তা রিতিমত পাগলামী। আর ও রাতে ফোন করে ফিসফিসিয়ে কথা বলত, যাতে কেউ শুনতে না পায়। আমি ওকে অনেকবার বলেছি, তুমি রাত জেগে থাক কেন? অনিয়মিত ঘুমের কারণে অসুখ হতে পারে। “প্রভা” বলত, তুমি আমাকে জ্ঞান দিওনা তোমার অসুবিধা হলে বল আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবনা। একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যেতাম। দু'তিন দিন অভিমান করে থাকত। মেইল ও করতনা, ফোনও রিসিভ করতনা। কত নাম্বার থেকে চেষ্টা করতাম, এখানকার কোড নাম্বার দেখলেই ফোন কেটে দিত। আবার রাতে অন্তত একবার ওর সাথে কথা না হলে আমারও ভাল লাগতনা। অনেকগুলো এস. এম. এস. করে আবার অভিমানের মেঘটুকু সরাতাম। এর পর স্বাভাবিক হয়ে বলবে তুমি জান, এ দু'তিন দিনে আমি অনেক সুকিয়ে গেছি। তোমার সাথে কথা না বললে আমি খাওয়া-দাওয়া ঠিক ভাবে করতে পারিনা। আমি তখন আশ্চর্য্য হতাম। চিন্তা করতে থাকলাম আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। এটাতো বন্ধুত্বের পর্যায়ে পড়েনা। তাহলে আমাদের গন্তব্য কোন দিকে এগুচ্ছে। ভুল আমরা দু'জনেই করছি কিন্তু ওর বাড়াবাড়িটা একটু বেশি ছিল। এ থেকে উত্তরন চাই কিনা তার কোন সদুত্তর পেলাম না নিজের কাছে।

আমাদের এ বন্ধুত্বের মধ্যে কখনযে ও আমাকে এত প্রচন্ড ভালোবেসে ফেলেছে আমি বিন্দু মাত্র টের পাইনি। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা কেউ কাউকে কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিনি। পারিবারিক কোন বিষয় নিয়ে আমরা কখনো, কেন যে, কেউ কারো কাছে জানতে চাইনি তাও জানিনা। আমি প্রবাসে কি চাকুরী করি প্রসংঙ্গ ক্রমে নিজ থেকে জানিয়েছি। “প্রভা” কি চাকুরী করে সেও একইভাবে আমাকে জানিয়েছে। তবে আমি আন্দাজ করে নিয়েছি আমার জানু গ্রাজুয়েট । কারন, গ্রাজুয়েট না হলে একটা প্রাইভেট ফার্মে ভাল পোস্টে চাকুরী করা যায়না। আর এটা আমাকে অনেক ভাবাত। আবার মনে হত ফ্রেন্ডশীফের জন্য বয়স এবং অন্যান্য কিছু কোন সমস্যা হতে পারেনা। এটা শুধু আমার মতামত ছিল। যা আমি ওকে জানিয়েছি। আমি বলেছিলাম ভালোবাসা বা বন্ধুত্বে ক্ষেত্রে বয়স কোন ফ্যাক্টর কিনা আমার জানা নেই। তবে যতটুকু জানি, দুষ্ট ভালোবাসা এবং দুষ্ট বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই প্রতিবন্ধকতা আছে। আমার জানা ছিলনা ওর মতামত কি ছিল। আমি ওকে কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি।

দীর্ঘদিন আলাপ চারীতার পর স্বভাবতই ওকে দেখার জন্য মত চাইত। কিন্তু বলব-বলব করে বলা হয়না। চিন্তা করলাম এভাবে আর বলা হবেনা। একদিন মেইল করে দিলাম, বললাম তোমাকে দেখার জন্য মন চাইছে খুব, যদি পারো তোমার একটা পটো মেইল করে দিও। আমার মেইল পাওয়ার দু'তিন দিনের মধ্যেই আমার জানু ওর পটো মেইল করে দিল। ওর পটো দেখে আমার কল্পনার “প্রভা” কে খুঁজে পেলাম। ঠিক যেমনটি আমি কল্পনা করেছি মনে হয় তার চাইতে একটু বেশি সুন্দর আমার “প্রভা”। দেখলে মনে হয় এ যেন কোন

অপ্সরী বা বেহেশতের হুর। "প্রভা" কে, যে বিশেষনে বিষেশায়ীত করা হোক না কেন, মনে হয় যেন কম হবে। ওর পটো পাওয়ার পর আমি ওকে যে মেইলটি করেছিলাম তা ছিল এরকম,

জানু শুভেচ্ছা নিও, আশা করছি ভাল আছ, ঠিক এই কামনাটাই করি সব সময়। আমিও ভাল। জানু, তোমার তোমার ছবি আমি পেয়েছি। তুমিযে কি, তা তুমি নিজেও জানোনা। তোমার রূপের প্রশংসা করব সে সাধ্য আমার নেই। জানি দুনিয়াটা সুন্দরের পূজারী, তাহলে আমি তার ব্যতিক্রম হব কেন? তবে কথা আছে, সবাই যদি বাহ্যিক সুন্দরটাকে বিচার করে তাহলে, এই দুনিয়ার ধ্বংস কেই ঠেকাতে পারবেনা। একজন বন্ধুর কাছ থেকে আমার যে প্রত্যাশা তা হল, ভাল বা সুন্দর একটা মন, আর তোমার কাছে শুধু ভাল বা সুন্দর মন নয়, তোমার বাহ্যিক সৌন্দর্যটাও বিমোহিত করার মত। আমি মনে করি আমার প্রত্যাশার একশত ভাগ তোমার মাঝে বিরাজমান। ওর অনুরোধ ছিল যেদিন ওর পটো পাব ঠিক সেদিন আমার পটো মেইল করে দিতে হবে। কিন্তু আমার কোন ছবি না থাকায় আমার জানুর অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারিনি। তবে আমার জানুর অনুরোধের ঠিক দশ দিনের মধ্যে ওকে আমার ছবি মেইল করেছি এবং জানতে চেয়েছি তার অনুভূতি। আমার জানু আমার ছবি পেয়ে আমাকে মেইল করেছে, কিন্তু ছবির ব্যাপারে কিছু লিখেনি, শুধু বলেছে আমি তোমাকে ফোন করে আমার প্রতিক্রিয়া জানাব।

আর এ জন্য আমার জানু সময় নিয়েছে একদিন, একদিন পরে আমাকে ফোন করে বলে, তোমার ছবি পেয়ে আমি এতটাই আন্দোলিত ছিলাম যে তোমাকে বোঝাতে পারবনা। আমি মনে করেছি "প্রভা" আমার সাথে দুষ্টমি করছে, তাই এমন বনিতা করছে। হয়তঃ শেষ সময়ে বলবে তুমি পচাঁ। তাই আমি একটু ধমকের সুরে বললাম তুমি বণিতা না করে তাড়া-তাড়ি বল আমার দেরি সহ্য হচ্ছেনা। ও আবারো বলে, বলছি গো সাহেব বলছি, একটু অপেক্ষা কর। নিজের প্রসংশা শোনার জন্য এমন দরপর করছ কেন? আচ্ছা বলছি শোন, কি, বলব? আমি বললাম তুমি এমন করছ কেন? আমি লাইন কেটে দিব। "প্রভা" বলে তুমি লাইন কেটে দিলে আমি কি আর ফোন করতে পারবনা? আচ্ছা ঠিক আছে আমি এবার বলছি, তোমাকে আর লাইন কাটতে হবেনা। শোন আমার বাবু সোনা, তোমার ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে তুমি আমার স্বপ্নের সেই রাজকুমার, বুজেছ বাবু সোনা? এই কথাটা বলে "প্রভা" লাইনটা কেটে দিল। ওর কথা শুনে আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিনা, কথাটা বার-বার আমার কানের মধ্যে পতিধ্বনি হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি কিছু ভুল শুনেছি। আমার কান গরম হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমি দেখতে শুনতে খারাপ নই তবে এতটুকু বেশি শুনতে পাব তা আমার কল্পনায় ছিলনা। পরে শত চেষ্টা করেও আমি "প্রভা" কে ওই দিন ফোনে পাইনি। "প্রভা" ওর সেলফোন বন্ধ করে রেখেছে। এর পর চুপ-চাপ থেকে আরো কিছুদিন অতিবাহীত হয়ে যায়।

এর মধ্যে আমার এক বান্ধবীর মাধ্যমে জানতে পারি আমার জানু অসুস্থ। ঠিক একই সময়ে অফিসে আমারো কাজের চাপ বেড়ে যায়। অফিসে কাজের এতই চাপ ছিল যে, মেইলটা দেখব সে সময়টা আমার নেই। কোন খোঁজ-খবর না পাওয়াতে একদিন একটা এস. এম. এস. করেছি, শুধু লিখেছিলাম তুমি কেমন আছ? আমার খুব ব্যস্ততা তাই আমি মেইল করতেও পারছিনা এবং দেখতেও পারছিনা তুমি রাগ করনা। আমি ফ্রি হলে তোমার জন্য অনেক-অনেক সময় বরাদ্দ থাকবে। আমার যে বান্ধবী আমাকে ওর অসুস্থতার খবর দিয়েছে ও ঢাকায় থাকে। "প্রভা"র সাথে আমিই ওকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছি। এখানে আরেকটা বিস্ময় হচ্ছে, আমার এ বান্ধবীটিকে আমি কখনো দেখিনি। ঠিক তেমনি ভাবে বান্ধবীটিও আমাকে দেখেনি। আমাদের পরিচয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। আমার এ বান্ধবীটি আমার খুবই ঘনিষ্ট বন্ধুর ঘনিষ্টজন। রিয়া নামের আমার এ বান্ধবীটির সাথে আমার মোবাইল ফোনে পরিচয় হয়েছিল চরম নাটকীয় ভাবে। অবশ্য এ নাটকের সুত্রপাতও আমার বন্ধু মোর্শেদের মাধ্যমে। আমি এবং আমার বন্ধু মোর্শেদ আমরা দু'জনেই প্রবাসী। একই দেশে হলেও একজন অন্য জনের কাছ থেকে অনেকটা দুরত্বে অবস্থান করছি। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ হয়নি বা হয়না এমন দিন নেই। দুরত্ব থাকলেও মোবাইল ফোনের কল্যানে আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো শেয়ার করতাম সবসময়, যা এখনো অব্যাহত আছে।

আমার বন্ধু বলে নয়, এমনিতেই মোর্শেদ অত্যন্ত আবেগ প্রবন, যথেষ্ট উদার প্রকৃতির এবং বন্ধু প্রবন। তবে ওর এই উদারতা ওর জন্যই কোন একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে। "হাজী মোহাম্মদ মহসীন" এবং "হাতেম তাই"য়ের দিন সেই কবে শেষ হয়ে গেছে। যুগের সাথে পরিবর্তন এসেছে বর্তমান মহসীনদের ক্ষেত্রে। আগের "হাজী মোহাম্মদ মহসীন" এবং "হাতেম তাই"য়ের যে নতুন সংস্করন তাতে ঘটেছে আমুল পরিবর্তন। এসব কিছুই হচ্ছে কালের আবর্তনে। সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অনেকবার তাগাদা দিয়েছি মোর্শেদকে। কিন্তু না, সে তার খোলস থেকে বের হতে পারেনি। হয়তঃ এ খোলস থেকে কোন একদিন মুক্ত হবে, কিন্তু ততক্ষনে দেখবে হাতের নাগালে কিছুই নেই। ওকে না দেখলে বোঝা যাবেনা নিজের জীবনের প্রতি কোন মানুষ এত উদাস হতে পারে!!

মোর্শেদরা পারিবারিক ভাবে সম্পদশালী। ঢাকায় ওদের ব্যবসা-বানিজ্য, বাড়ীগাড়ি আছে। গ্রামের বাড়ীতেও অগাধ সম্পদের মালিক ওরা। ওদের পরিবারের মোর্শেদ ছাড়া বাকী সবাই দেশে থাকে। বড় ভাইয়ের সাথে ছোটভাইরাও ব্যবসায় হাত বাটায়। মোর্শেদের ছোট যে ভাইটি, দেখতে শুনতে সুদর্শণ এবং স্মার্ট, চাকুরী করে একটি প্রাইভেট ফার্মে। সেই সাথে যতটুকু সম্ভব নিজেদের ব্যবসাও দেখাশোনা করে। তবে মোর্শেদ ওদের সবার চাইতে একটু বেশি ব্যতিক্রম । মোর্শেদ ভালবাসে ওর এক আত্মীয়া রিয়াকে। রিয়াকে আমি কোন দিন দেখিনি তাই তার অবয়ব সম্পর্কে আমার ধারনা নেই। মোর্শেদ যখন প্রথম বার ছুটিতে দেশে যায় তখন পরিচয় হয় রিয়ার সাথে। রিয়াও ঢাকাতে থাকে, ঢাকার একটা কলেজ থেকে অনার্স করছে। মাত্র কয়েকদিনে মোর্শেদ-রিয়ার মনে জায়গা করে নিয়েছে। মোর্শেদ খুব সুন্দর এবং স্মার্ট। প্রথম দেখায় যে কোন মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করার মত চেহারা এবং ফিগার ওর আছে। যে কারনে রিয়াও চোখ ফেরাতে পারেনি।

মোর্শেদের বর্ণনা অনুযায়ী রিয়া ছিল তার কাছে অসাধারন এবং অদ্বিতীয়া। প্রথম বার দেশ থেকে ছুটি শেষ করে ফেরার পর যে কোন কথার প্রসংঙ্গে সুযোগ পেলেই রিয়াকে নিয়ে আসত মোর্শেদ কথার মাঝখানে। যা আমাদের বন্ধুদের বিরক্তির কারন হয়ে উঠত। এত প্রশংসা করত যা তুলে ধরতে গেলে বড়-বড় কাহিনী গুলোর একটা হয়ে যাবে। মোর্শেদ দেশ থেকে ফিরে আসার পর কিছুদিন ভালই চলছিল ওদের যোগাযোগ, এবং সে এগুলো শেয়ার করত আমার সাথে। এর কিছুদিন পর কাজের ব্যস্ততার জন্য আর কোন খোঁজ নিতে পারিনি আমার প্রান প্রিয় হবু রিয়া ভাবীর। বলতে না বলতে বছর চলে গেল, আবার ছুটিতে গেল মোর্শেদ। যাওয়ার আগে বলেছিল মানসিক ভাবে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রিয়াকেই বিয়ে করবে কিনা তা পরিস্কার করে বলে যায়নি, শুধু বলেছে বিয়ে করবে। মোর্শেদ আমার প্রবাস জীবনের বন্ধু। আমার দীর্ঘ এই প্রবাস জীবনে ওর মত ছেলে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। যার জন্য আমাদের মধ্যে এত মিল ছিল যা বোঝানো কঠিন। মোর্শেদ এবং আমি আমরা দু'জনই বাংলাদেশের দু'প্রান্তে। তার পরও ওদের পরিবারের মোটা-

মোটি সব সদস্যের সাথে আমার পরিচয় আছে বা আমাকে চেনে। মোর্শেদ দ্বিতীয়বার যখন ছুটিতে দেশে যায় আমিও তখন দেশে যাই ছুটিতে। তবে ও আমার আগে যাওয়াতে ঠিক তেমন একটা সময় আমি ওর সাথে কাটাতে পারিনি। ব্যক্তিগত কাজে যখন ঢাকা যাই তখন আমি ওদের বাসায় উঠেছিলাম। ওদের ঢাকার বাসাতে গৃহকর্তী হিসেবে আছে ওর ভাবী, খুব ভাল একজন মহিলা, যেন লক্ষির স্ব-রূপে আবির্ভাব, ওদের সংসারটাকে লক্ষির সংসার বললে ভুল হবেনা। এমন মানুষ সংসারে থাকলে সংসারটা হয়ে উঠে স্বর্গীয় সুখের ঠিকানা। যা না দেখলে অনুধাবন করা মুশকিল। যে স্বর্গের সুধা সৌভাগ্যক্রমে পান করার সুযোগ আমারও হয়েছে। ভাবী সংসারটাকে যত্ন করে আগলে রেখেছেন, আগলে রেখেছেন ছোট ভাইয়ের মত দেবরদেরকেও। যে কারণে ভাবীকে খুব পছন্দ করে মোর্শেদ। মোর্শেদের বাবা-মা আছেন, উনারা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে। তবে ঢাকার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আছে গ্রামের সাথে। প্রত্যেক দিন কয়েকবার করে ফোন করে গ্রামে থাকা মা-বাবার খোঁজ-খবর নেন মোর্শেদের ভাইরা। সব কিছু মিলিয়ে আমার এ দু'দিন খুব ভালভাবে কাটল।

ওদের বাসায় থাকার দ্বিতীয়দিন মোর্শেদ ফোন করেছিল রিয়ার কাছে। দু'জনে কিছুক্ষন কথা বলার পর মোর্শেদ আমাকে বলে, তুই থাকলে আমি রিয়ার সাথে ডেট নিতে পারি, তুই থাকবি আমাদের সাথে, সেই সাথে ওর সাথে পরিচিত হবি। কিন্তু আমার বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার তাড়া থাকায় সে অমৃত সমান সুযোগ আমাকে হাত ছাড়া করতে হয়েছে। আমার ছুটি কম থাকায় আমি কাজের বাইরে কোথাও বেশি সময় বেশি সময় থাকতে পারিনি। আমার মমতাময়ী মা এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন বাবা প্রতিটা মুহূর্ত আমার চিন্তায় অস্থির। ফোনের পর ফোন করে খবর নিচ্ছে বাবা তুমি এখন কোথায়, কি করছ, খাওয়া-দাওয়া ভালভাবে করবে, সাবধানে চলাফেরা করবে, কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ী ফিরে এসো, ইত্যাদি-ইত্যাদি। বাবা-মায়ের এমন অবস্থা দেখলে মনে হয় তারা তাদের দশ-বারো বছরের ছেলেটাকে এই প্রথম বাড়ীর বাইরে বের হতে দিল, আর দিয়েই যত চিন্তা। আমার বাবা-মায়ের এমন অবস্থায় আমার চোখের কোনে পানি জমত। মন চাইত সব কাজ চেড়ে এখনি বাড়ী পোঁছি। কিছুক্ষন বসে থাকি সে মমতাময়ী মায়ের আঁচল ঘেষে।

আমার এবার দেশে আসার কাহিনীটাও অনেকটা এ রকম, আমার বাবার কান্না আমাকে আর প্রবাসে থাকতে দেয়নি। দেশ থেকে ফোনে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কবে আসবে দেশে? বাবাকে বলেছিলাম আর কিছুদিন সময় দিন, সব কিছু গুঁছিয়েই আমি দেশে আসছি। বাবা আবারো জানতে চাইল সে সময়টা কতদিন? তখন বাবাকে বললাম আরো এক বছর, এ কথা বলার সাথে-সাথে বাবার যে কি কান্না! বাবার কান্না শুনে নিজেও ধরে রাখতে পারিনি চোখের পানি। বাবা বলেছিল আমার কোন কিছুর দরকার নেই। আমি শুধু তোমাকে চাই, তোমাকে একবার দেখতে চাই। তুমি আগামী দু'য়েক মাসের মধ্যে বাড়ীতে আস। বাবাকে কথা দিয়েছি আমি আসব। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাবার কথা রাখতে মাত্র এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম। দীর্ঘদিন পর মাত্র চল্লিশ দিনের ছুটিতে দেশে যাওয়ার পর সব কিছু কেমন জানি ঘোরের মত লাগল, এর রেশ কাটতে না কাটতে আবার ফিরে আসা। আমার স্বল্প সময়ের ছুটির কারনে সেই দিন পরিচিত হতে পারলাম না আমার প্রানের চেয়ে প্রিয় বন্ধুর প্রেয়সীর সাথে।

ঔদিনই মোর্শেদদের বাসার সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম মমতাময়ী মা এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন বাবার উদ্দেশ্যে বাড়ীতে। গাড়ীতে পথ যেন পুরাতে চায়না। ঢাকা থেকে চট্রগ্রাম আসতে ঐ দিন যে সময় লেগেছিল তা আগের চাইতে তিন গুন বেশি মনে হয়েছিল। বাড়ীতে পোঁছে দেখি আমার মা ঘর আর উঠোনে পায়চারী করছে। একবার ঘরেতো একবার বাইরে। আমার মা আমাকে দেখে দোড়ে এসে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছে মনে হয় আবারো অনেক বছর পর প্রবাস থেকে ফিরলাম মায়ের কাছে। মা চোখে মুখে চুমো খেয়ে অনেক্ষন জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। আমার মা জানেনা আর মাত্র দু'সপ্তাহ পরে এই ছেলেটিই চলে যাবে মায়ের কাছ থেকে ছয় হাজার কিলোমিটার দুরে। যেখান পর্যন্ত মায়ের চোখ যাবেনা। আবারো বুকে পাষান বাঁধতে হবে মাকে। হয়তঃ বছর দু'বছর পর আবারো কেদেকেটে বলবে বাবা চলে এসো তোমাকে দেখতে মন ছাইছে। হায়রে নিয়তি।

আমি ঢাকা থেকে ফেরার দু'দিন পর মোর্শেদ প্রবাসের উদ্দেশ্যে রওনা হল। ফিরতে তাকে হবেই। এবারও ওর বিয়ে করা হলোনা। কারণ, ওর ছুটি শেষ। মোর্শেদ পোঁছার পর আমাকে ফোন দিয়েছিল ও ভালভাবে পোঁছেছে। আমি বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর আর রিয়ার কথা মনে রইলনা। কারণ, তখনো রিয়া আমার কাছে কোন বিষয় ছিলনা যে ওকে মনে রাখতে হবে। দেখতে না দেখতে আমার ও ছুটি শেষ হয়ে গেল। মমতাময়ী মা, পরম শ্রদ্ধাভাজন বাবা, স্নেহের ছোট বোনের অশ্রুসিক্ত করুন মুখ গুলো দেখে আবারো প্রবাসের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে হয়েছে। ফিরে এলাম আপন কর্মস্থানে। এখনো বার-বার চোখের সামনে ভেসে উঠে মা-বাবা আর বোনের সেদিনের সেই করুন মুখ।

এখানে এসে পোঁছার ঠিক দু'ঘন্টা পর আমার প্রান প্রিয় বন্ধু মোর্শেদ এসেছে আমার সাথে দেখা করার জন্য। দেশ থেকে ফিরে আসার কিছু সময় পর মোর্শেদকে পেয়ে কিছুটা ক্লান্তি দুর হল। কুশল বিনিময় করে জানতে চাইলাম তোর রিয়ার খবর কি? উত্তরে মোর্শেদ বলল আগে বিশ্রাম কর, অন্য একদিন সময় করে এসে তোকে বলব। আমার ডিউটি আছে আমি এখন যাব। এর কিছুক্ষন পর মোর্শেদ চলে গেল নিজের কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে। আমি আমার রুমমেটদের সাথে কিছুক্ষন সময় কাটিয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম। পরের দিন শনিবার অফিসে যেতে হবে, তাই উঠে পরেরদিন অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাত্রের খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। পরেরদিন ঘুম ভাঙ্গো অনেক ক্লান্তির মধ্য দিয়ে। এমন অবস্থা, বিছানা ছাড়তে মন চায়না। এখানে ফিরে আসার পর আমার মনে হয়নি আমি এ জায়গাটা ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলাম। এমন মনে হওয়ার কারণ, অতিদ্রুত সময়ে ছুটি শেষ করে ফিরে আসা।

পরের দিন সকাল আট্টার আগেই আমি অফিসে হাজির। এখানেও তেমন কোন পরিবর্তন নেই। সামান্য পরিবর্তন আমার টেবিলের, যেখানে পড়ে আছে কিছু অগোছালে কাগজ পত্র। সব কিছু ঠিক করে যথারিতি কাজে মনোযোগ দিলাম। এক-এক করে অফিসের এ্যারাবিয়ান বসরা আসতে লাগলো আর সবার সাথে কুশল বিনিময় করলাম। এভাবে কিছুদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। এই সময়ে মোর্শেদের সাথে কথা হয়েছে খুব সামান্য। কাজের ব্যস্ততার কারনে তেমন একটা কথা হতনা। ব্যস্ততা কমে আসার পর একদিন মোর্শেদকে ফোন করি দুপুরের পরে, সব প্রসঙ্গা শেষ করে তার প্রেয়সীর কথা জানতে চাইলাম। ও বলল যোগাযোগ আছে, ফোনে কথা হয়, এস. এম. এস. বিনিময় হয়, মোটামোটি ভালই চলছে। তবে ওদের মধ্যে মান-অভিমানটা সব সময় লেগে থাকত, আসলে এটাইকি প্রেম? এখানেই কি প্রেমের স্বাদ? এর কিছুদিন পর মোর্শেদ আমাকে বলে রিয়ার নাম্বার নিয়ে একটু যোগাযোগ করে দেখ ও কেমন আছে। আমার সাথে রিয়ার আগে কোন কথা হয়নি, তাই রিয়া যেমন আমার সম্পর্কে অবগত নয়, আমিও রিয়া সম্পর্কে অবগত নই। তার পরও নাম্বার দিল মোর্শেদ। অফিস আওয়ারের পর ডায়াল করলাম ০১৮১৩১...নাম্বারটি। দু'তিন বার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে ভেসে এল এক সুরেলা আওয়াজ,

- হ্যালো স্লামুয়ালাইকুম, কে বলছেন প্লিজ!

– ওয়ালাইকুম সালাম, আমি সাজ্জাদ বলছি, আপনি কি রিয়া?
– হু আমি রিয়া। আপনি কোন সাজ্জাদ? কোথা থেকে বলছেন?
– আপনি আমাকে চিনবেন না, আমার বাড়ী চট্টগ্রামে, আমি দেশের বাইরে আছি।
– চিনবোনাতো ফোন করেছেন কেন? আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?
– এই সিমটা আমি একজনের কাছ থেকে নিয়েছি, ভুল করে এই নাম্বারটা ও ডিলিট করেনি। তাই লোভ সামলাতে না পেরে ফোন দিলাম।
– দেখুন, আপনি সত্যি করে বলুন আপনি কে?
– বললাম না, আমি সাজ্জাদ?
– আমি কোন সাজ্জাদ কে চিনিনা, তাই কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না।
– আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? আগে চিনতেন না তো কি হয়েছে, এখন থেকে চিনবেন।
– আপনি কি চান আমার কাছে?
– একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছে কি চায়?
– দেখুন আপনি সীমা অতিক্রম করছেন!
– আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সীমার মধ্যে থেকে আপনার বন্ধু হতে চাই।
– আমার অনেক বন্ধু আছে, আর কোন বন্ধুর আমার দরকার নেই। আচ্ছা আপনার পাশে যে আছে ওকে একটু দিবেন?

(ও মনে করেছিল এখান থেকে মোর্শেদ দুষ্টমি করছে ওর সাথে। কিছুক্ষন পর যখন বুজল, না, মোর্শেদ না, পরে ভেবেছে মোর্শেদ হয়তঃ সাথে আছে ও এগুলো করাচ্ছে।)

- আমার পাশেতো কেউ নেই।
– আপনি আর আমাকে ফোন করবেন না বলেদিলাম।
– কেন? একজন বন্ধু হয়ে বন্ধুর খোঁজ-খবর নেয়াটাকি অন্যায়?
– আমিতো বলিনি আপনি আমার বন্ধু বা আমি আপনার বন্ধু!
– এই যে আমি বলছি আমি আপনার বন্ধু।
– কি আর্শ্চয্য! আপনিতো দারুন নাছোড় বান্ধা লোক। এই আমি লাইন কেটে দিলাম।

এই কথা বলে রিয়া লাইন কেটে দিল। সাথে-সাথে মোর্শেদ কে ফোন করে রিয়ার সাথে কথোপকথোনের বিষয়টি জানালাম। মোর্শেদ শুনে কতক্ষন হাসল। আমি অফিস থেকে বাসায় চলে গেলাম। এর পরদিন এখানকার সময়ে প্রায় দুপুরে বাংলাদেশ থেকে এক অপরিচিত নাম্বার মিস কল আসল। জানতামনা নাম্বারটা কার। মোর্শেদ কে ফোন করে নাম্বারটার ব্যাপারে অবগত হলাম। মোর্শেদ বলল, এটা আমার কাজিনের নাম্বার। মোর্শেদের কাজিন উল্টো দিক দিয়ে রিয়ারও কাজিন। রিয়া এবং মোর্শেদের কাজিন দু'জন একই কলেজে ইয়ারমেট। মোর্শেদের কাজিন আমাকে চিনত, কিন্তু আমার নাম্বার জানতনা, যার জন্য ও আমাকে চিনতে পারেনি। নাম্বারটার ব্যাপারে সিউর হয়ে আমি মিস কল দেওয়া নাম্বারে কলব্যাক করলাম, আমার প্রস্তুতি ছিল মোর্শেদের কাজিন রিসিভ করলেও আমি বলব আমি মারুপ। যেই কথা সেই কাজ, আমি ফোন করার পর ওপাশ থেকে বেসে এল

– হ্যালো স্লামুয়ালাইকুম, আমি রিয়া বলছি।
– জ্বি, কোন রিয়া? দুঃখিত আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।
– আপনি কি সাজ্জাদ?
– জ্বি, আমিই সাজ্জাদ।
– আপনি গতকাল আমার সাথে কথা বললেন আজ ভুলে গেলেন!
– দেখুন আমি প্রতিদিন এত কল রিসিভ করি যা মনে রাখা অসম্ভব
– সব কল কি বাংলাদেশ থেকে যায়?
– না, না, বাংলাদেশ থেকে আমাকে এত কল করবে কে? আমার তো কোন বান্ধবী নেই।
– দেখুন, খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন না।
– আপনি ভুল বুঝছেন, আমি আপনাকে খোঁচা দেইনি, যা বাস্তব তাই বলছি।
– আচ্ছা যদি বাংলাদেশ কেউ কল না করে তাহলেতো আপনি আমাকে চেনার কথা।
– কিভাবে চিনব, আপনিতো আমাকে কখনো কল করেননি। এবার থেকে আপনি কল করলে আমি ঠিকই আপনাকে চিনে নিব। বলুন আপনি আমাকে কল করবেন।
– ঢং করবেন না।
– না, ঢং নয়, আসলে আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তবে এখন চিনেছি, আপনার সাথে গতকাল আমার কথা হয়েছে। এতক্ষন না চেনার জন্য সরি।
– আচ্ছা থাক-থাক সরি বলতে হবেনা।
– ঠিক আছে তুলে নিলাম
– কি তুলে নিলেন?
– সরি কথাটা।
– হ-হা-হা।
– আপনি হাসলেন?
– হাসবোনাতো কি করবো, কাঁদবো?
– না, না, আপাততো হাসুন, কাঁদার সময় হলে আমি বলব। তখন না হয় কাঁদবেন।
– কি বললেন?
– যা বলেছি আপনি সব শুনেছেন
– হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু কোন সময়ের কথা বললেন যখন আমাকে কাঁদতে হবে।

– আরে আপনাকে নিয়েতো মহা ঝামেলা! প্রত্যেক কথার মতলব খোঁজেন!
– মতলব থাকলে খুঁজবনা!
– শুনুন আমার কথাতে কোন মতলব ছিলনা। এখন বলুন কেন আমাকে স্মরন করেছিলেন?
– আপনি আমার নাম্বারটা কোথায় পেয়েছেন?
– আচ্ছা, আপনার সমস্যাটা কি? আবারো একই প্রশ্ন করছেন! আমি আপনাকে কৈফিয়ত দিতে পারবনা।
– আমি আপনাকে কৈফিয়ত দিতে বলছিনা, আপনাকে নাম্বারটা কে দিয়েছে শুধু তা জানতে চাচ্ছি।
– দেখুন আপনার যদি কথা না বলার ইচ্ছে হয় বলবেন না, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারবেন না।
– বারে! আপনি আমার নাম্বার নিয়ে আমার সাথে কথা বলছেন, যাকে আমি চিনিনা, জানিনা। জিজ্ঞেসও করতে পারবনা এ কেমন কথা!
– দেখুন আমি এখন অফিসে, এখন আর কথা বলার মত সময় আমার হাতে নেই। আপনি যদি বলেন আমি আমার অফিসের পরে আপনাকে কল দিতে পারি।
– কেন কল দিবেন? আমি কি বলেছি?
– আরে? আপনিতো দেখছি আসলেই ঝামেলা! দোষ আপনার নেই, পামেলাদের এই একটাই সমস্যা তাহল, ঝামেলা করা।
– দেখুন, ভদ্রভাবে কথা বলুন।
– আমার এখন ভদ্রতা শেখার সময় নেই। যদি মন চায় পরে আপনার কাছ থেকে শিখে নেব।
– আমার বয়েই গেছে আপনাকে ভদ্রতা শেখাব।
– সব কথাতো আপনিই বলছেন!
– আচ্ছা, আপনার অফিস শেষ হবে কখন?
– বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটায়।
– আচ্ছা, আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।
– কেন?
– কেন মানে? আপনি না বললেন ডিউটির পর ফোন দিবেন?
– ও বলেছি নাকি? আব আয়া উট পাহাড় কা নীচে।
– বাংলা বলেন! স্মার্ট সাজার দরকার নেই।
– স্মার্ট সাজব কেন? আমিতো এমনিতেই স্মার্ট।
– আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে আপনি থাকুন আপনার স্মার্টনেস নিয়ে।
– ভালো থাকুন, আল্লাহ্ হাফেজ
– বাই, আল্লাহ্ হাফেজ।

দ্বিতীয় বারের মত এখানেই রিয়ার সাথে আমার কথা শেষ করি। মোর্শেদের কাজিন তখনও আমাকে চিনতে পারেনি। যার জন্য আমি তখনো তাদের কাছে অজানাই রয়ে গেলাম। রিয়ার সাথে কথা বলে আমি মোর্শেদকে সব বলেছি, কি ধরনের আলাপ চারিতা আমার আর রিয়ার মাঝে হয়েছে। আবার দু'জনে মিলে সমস্বরে হাসলাম। মোর্শেদকে বললাম আমার অফিস শেষ হলেতো আবার ফোন করতে হবে ওরা আমার অপেক্ষায় থাকবে, ফোন করব নাকি? মোর্শেদ ফোন করার জন্য অনুমতি দিল। কিন্তু আমার মোবাইল একাউন্ট যে খালি, ফোন করব কিভাবে। মোর্শেদ কে বলার পর ও মোবাইলের স্ক্র্যাচ কার্ডের নাম্বার দিল, আমি রিচার্জ করে নিলাম। মোর্শেদ বলল ফোন করে আমাকে জানিয়ে তার পর বাসায় ফিরবি।

এর পর আমি অফিসের কাজে মনোনিবেশ করলাম। এদিকে আর খবর রইলনা। অফিসে থাকা অবস্থায় আসরের নামাজের আযান হল। অফিসের পাশের মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করে আবার অফিসে ফিরে টেবিলের উপর রাখা মোবাইলের উপর চোখ পড়ল, দেখি পাঁচটা মিস কল। এর মধ্যে দু'টা আমার রুম পার্টনারের, আর তিনটা মোর্শেদের প্রেয়সী রিয়া দিয়েছে তার কাজিনের নাম্বার দিয়ে। তখনো আমার অফিস টাইম শেষ হতে আধ ঘন্টা বাকী আছে। এই আধ ঘন্টায় আরো দুটা মিস কল এলো একই নাম্বার থেকে। চারটা বাজার সাথে-সাথে অফিসের সবাই চলে যেতে লাগল। আমিও তৈরী যাওয়ার জন্য। অফিস শেষে প্রচন্ড ক্ষুদা, আর ক্লান্তি, মাথাটা ঝিম ধরে আছে। ফোন করব না করব দ্বিধা দ্বন্ধে আছি। কিছুক্ষন চিন্তা করে মোর্শেদের কাজিনের নাম্বারে কল দিলাম। ও পাশ থেকে আবার সেই সুরেলা আওয়াজ
– হ্যালো স্লামুয়ালাইকুম, আমি রিয়া বলছি।
– ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন আপনি?
– জ্বি, আমি ভাল, আপনি কেমন আছেন?
– এই আছি কোন রকম।
– যেভাবে বলছেন মনে হয় যেন হাসপাতালে আছেন!
– এ রকম মনে করাটা অসংগত নয়।
– কেন, কি হয়েছে আপনার?
– না, তেমন কিছু হয়নি, মনের সমস্যা
– মানে?
– মনের অসুখ হয়েছে।
– আবার শুরু করলেন?
– কি?
– ঢং
– এখানে ঢংয়ের কি আছে!
– ঢং নাতো কি?
– আচ্ছা আপনি এমন কেন?

- কেমন?
- এই যে, রসকষহীন ভাবে কথা বলেন।
- দেখুন, আমার কথা বলার ষ্টাইল এ রকম।
- একটু পরিবর্তন করেন না প্লিজ।
- দেখুন আমি আপনাকে রং তামাশা করার জন্য ফোন করতে বলিনি।
- কি জন্য ফোন করতে বলেছেন?
- জরুরী কথা বলার জন্য ফোন করতে বলেছি
- তাহলেতো আপনিই ফোন করতে পারতেন। আমাকে মিস কল দিলেন কেন? এখন আমি ফোন করেছি আমি বলব আপনি শুনবেন, আর যখন আপনি ফোন করবেন আমি শুনবো আপনি বলবেন।
- খুব লম্বা লেকচার দিলেন, শুনে গা জ্বালা করছে।
- স্বাভাবিক, করতেই পারে। এ রকম উচিৎ কথা শুনলে আমারও করে
- আপনি আমার মুড খারাপ করে দিলেন।
- আচ্ছা, সঠিক সময়ে সঠিক শব্দ প্রয়োগে কারো মুড নষ্ট হয় আমার জানা ছিলনা।
- আসলে আপনার জানার অনেক অভাব আছে।
- দয়া করেন আমার উপর, আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে একটু জ্ঞান দিন। তাহলে আপনার আর কষ্ট করতে হবেনা।
- না, আমি এত বড় ছাত্রের মাষ্টার হতে চাইনা।
- কেন, সমস্যা কি ছাত্রতো ছাত্রই বড় আর ছোট দিয়ে কি হবে।

আমি দেখলাম আমার কথার খেই হারিয়ে ফেলছি। কারণ, আমি বিষন্ন ছিলাম। মনে করলাম এখানেই শেষ করা দরকার আর বাড়াতে থাকেলে উল্টা পাল্টা হয়ে যেতে পারে। তাই বললাম...

- দেখুন ম্যাডাম আমি এখন রাখলাম আপনার সাথে আমি অন্য একদিন কথা বলব।
- কেন এখন কি হল?
- এখন আমার সমস্যা আছে
- কিসের সমস্যা বলা যায়না
- না আপনাকে বলব কেন? আর বললেতো আপনি সমাধান দিতে পারবেন না।
- বলেই দেখুন না, দেখি কি করতে পারি।
- কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আপনি যদি চান আমি আগামীকাল সকালে আপনার নাম্বারে কল দিব।
- আচ্ছা তাই দিবেন।
- আল্লাহ হাফেজ।
- আল্লাহ হাফেজ।

ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইনটা কেটে দিলাম। কেটে দেওয়ার প্রায় সাথে-সাথে আবার মিস কল। আর সেদিকে খেয়াল না করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাসায় গিয়ে খাওয়া খাওয়া দাওয়া সেরে মোর্শেদকে কল দিলাম এবং বললাম আমার সাথে রিয়ার কথোপকথনের সারাংশ। কতক্ষন হাসাহাসির পর মোর্শেদ বলল ভুল করেও তোর কিংবা আমার নাম বলবিনা। আবার সকালে ফোন করবি। ওকে আমি একবার বলেছিলাম এভাবে ওকে টেনশন দিয়ে লাভ কি? জবাবে মোর্শেদ বলল, ওকে মদন টাইপের কিছু বানিয়ে তার পর আসল ঘটনা খুলে বলব। আমি তার কথায় আবারো হাসলাম। কি আর করা বন্ধুর কথা রাখতে হবে। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেওতো আনন্দ পাচ্ছি। দেখিনা কি হয়! মধ্যখানে বিরতি নিলাম। কিন্তু রিয়ার মিস কল বন্ধ নেই, প্রতিদিন দু'একটা মিস কল সে দিবেই। তখন বোঝার বাকী রইলনা যে, রিয়া অনেক টেনশন ফিল করছেনা। ওর জানার আগ্রহ প্রবল হচ্ছে আমি কে? কয়েক দিন বিরতির পর আবার একদিন বিকালে কল দিলাম রিয়াকে।

- হ্যালো স্লামুয়ালাইকুম, রিয়া বলছি।
- ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন মিস?
- জ্বি ভালো, আপনি কেমন আছেন?
- আন্দাজ করে নিনতো কেমন থাকতে পারি?
- দেখুন, আন্দাজ করতে পারবনা। বলতে চাইলে বলবেন না হয়...।
- দেখুন ম্যাডাম, আপনি কিন্তু আবার রেগে যাচ্ছেন!
- না আমি রাগব কেন? রাগতো করে মানুষ আপন জনের সাথে।
- কে জানে, হয়তঃ আমাকেও আপনি আপনজন ভাবতে শুরু করেছেন।
- আপনি আবার শুরু করে দিলেন? আপনার এ সমস্ত কাব্যিক কথা বার্তা রাখেন।
- আপনার মুখে ঘি-চন্দন। আমার কথা বলার ষ্টাইলকে আপনি কাব্যিক বলেছেন! আমার কিন্তু দারুন লাগছে।
- আচ্ছা, আপনার সমস্যাটা কোথায়?
- কেন? কি হয়েছে? আমিতো আমার কোন সমস্যা দেখছিনা। আপনি কি কোন সমস্যা দেখছেন? প্লিজ, বলেন না। আমি উপকৃত হব। আচ্ছা, আপনি কি ডাক্তার? তাহলেতো আরো মজা, আমি বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাতে পারব।
- আচ্ছা, আপনি কি এজন্য ফোন করেছেন?
- কি জন্য?
- এই যে রং তামাশা করার জন্য।
- দেখুন ম্যাডাম, এটাকে রং তামাশা বলে কিনা আমি জানিনা। আমিতো শুধু আপনার কথার পিঠে কথা বলছি।
- না, আপনি আমার সাথে তামাশা করছেন?
- আচ্ছা, আমার কথা যদি আপনার কাছে তামাশা মনে হয় তার জন্য দুঃখিত।
- ওকে, ওকে ঠিক আছে।
- ধন্যবাদ।

- আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি আমার নাম্বারটা কোথায় পেয়েছেন?
- (একটু রেগে গিয়ে) দেখুন বার বার একই প্রশ্ন শুনতে আমার আর ভাল লাগেনা। আপনি আমাকে আর এই প্রশ্ন করবে না।
- কেন করবনা?
- না করবেন না, আমি প্রথম দিন আপনার সাথে কথা বলার পর আপনার নাম্বার পর্যন্ত ডিলিট করে ফেলেছি। সেই সাথে আপনাকেও কিন্তু না, আপনি বার-বার মিস কল দিচ্ছেন তাই আবারো যোগাযোগ করতে আগ্রহী হলাম।
- আমি কি বলেছি যে, আপনি আমাকে ষ্টোর করে রাখেন।
- দেখুন, আপনী যদি ষ্টোর করার মত হতেন, অবশ্যই আমি আপনাকে ষ্টোর করে রাখতাম। আপনি সে রকম কিছু নন, তাই ডিলিট করে ফেলেছি।
- (রেগে গিয়ে) আমি এখন বলে দিলাম, আপনি আর কোন সময় আমাকে কল বা এস. এম. এস. দিবেন না। যত্ত সব!

এই কথা বলেই রিয়া ফোন কেটে দিল। হাসিও পায় আবাব কষ্টও লাগে। শুধু-শুধু একটা মেয়েকে এভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া, রিয়া কোন না কোনদিনতো জানবেই আমি কে। সাথে-সাথে মোর্শেদ কে ফোন দিয়ে সব জানিয়ে দিলাম। মোর্শেদ কতক্ষন হাসলো। আমি কিন্তু আর হাসতে পারলাম না। কেন জানি কষ্টটা আরো বাড়তে লাগল। অফিস থেকে ডিউটি শেষ করে বাসায় চলে গেলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুতে যাব তখন মোর্শেদের ফোন, বলল রিয়ার কাছে ফোন করে সব বলে দিয়েছি। তোর সম্পূর্ন বায়োডাটা দিয়েছি রিয়াকে। মোর্শেক কে জিজ্ঞেস করলাম কি বলল? ও বলে না কিছু বলেনি, হাসল। মোর্শেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রিয়ার কাছে ভাবী সম্মোধনে সরি বলে একটা এস. এম. এস দিয়ে ঘুমোতে গেলাম। রাত আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম রিয়ার দুটো মিস কল। ঘুমোতে যাওয়ার আগে হয়তঃ মোবাইল বন্ধ করে রাখি, না হয় সাউন্ড অফ করে রাখি। তাই বলতে পারিনি রিয়া কখন মিস কল দিল।

মনে মনে ভাবলাম একটা সমস্যা থেকে উত্তোরন হলাম। যেহেতু, রিয়া আমাকে আমি রিয়াকে কোন দিন দেখিনি তাই আর বেশি দুর এগোবেনা আর এগোনোর কথাও না। তাছাড়া এখানে অন্য আরো কিছু ব্যপার আছে, যা শেয়ার করা বাঞ্চনীয় নয়। যে ব্যপার আছে তা শুধু আমার পক্ষ থেকে। রিয়ার পক্ষ থেকে কোন সমস্যা ছিলনা। তা পরে জানা গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, অফিসে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এই সময়ে রিয়ার মিস কল। পর-পর কয়েক বার। আমার মোবাইলে ব্যালেন্স ছিলনা তাই ফোন দিতে পারিনি। অফিসে এসেই আগে রিয়াকে ফোন দিলাম। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম..

- কেমন আছেন।
- ওয়ালাইকুম সালাম, জ্বি ভাল। আপনি কেমন আছেন?
- জ্বি, আলহামদুলিল্লাহ্ আমিও ভাল।
- আমি একটু সাজ্জাদ কে চাচ্ছিলাম দিবেন কি?
- ম্যাডাম, দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে, সাজ্জাদ তো গত রাতে মারা গেছে!
- আরে কি বলেন! আমিতো গত কালই ওর সাথে কথা বলেছি।
- তা বলেছেন বৈকি। গতকালইতো সন্ধ্যায় মারা গেছে। আপনি হয়তঃ সন্ধ্যার আগে কথা বলেছেন।
- (দু'জনেই সমস্বরে হাসলাম) আপনি না। যা পারেন!
- কিছু মনে নিবেন না। আপনাকে অনেক টেনশন দিয়েছি।
- না, না ঠিক আছে। এখন আমার কাছে দারুন মজা লাগছে!
- তাই বুঝি?
- হু, তাই।
- ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার কথা শুনে নিজেকে অনেক হালকা মনে হচ্ছে।
- দেখুন, আমি আবারো বলছি, এ নিয়ে আর কোন টেনশন করবেন না। এখন থেকে আমরা ঋৎরবহফং, ঙশ?
- ঙশ, ঋৎরবহফং, ঃযধহশং ড়হপব ধমধরহ ভড়ৎ ুড়ঁৎ শরহফহবংং.
- দেখুন, এভাবে বলার দরকার নেই, আপনি মোর্শেদের বন্ধু, তাছাড়া আপনাকে আমারো ভালো লেগেছে তাই বন্ধুত্বে অফার দিলাম।
- ঠিক আছে আমি আপনার অফার গ্রহন করলাম। পরে কথা হবে এখন আমি অফিসে আছি, তাছাড়া বুঝতেই পারছেন এখন সকাল বেলা, দিনের প্রথম ভাগ। ভালো থাকেন, খুব ভালো। আল্লাহ হাফেজ...।
- আপনিও ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ...।

আর এভাবেই রিয়ার সাথে আমার যোগাযোগ। এটাকে পরিচয় বলা যায় কিনা জানিনা। কারণ, আমরা কেউ কারো পটো পর্যন্ত দেখিনি। পরিচিত হতে হলে একজন অন্য জনকে চেনার দরকার আছে। সে ক্ষেত্রে এটাকে পরিচয় না বলে যোগাযোগ বললে মনে হয় বেশি মানানসই হবে। রিয়ার সাথে যোগাযোগের দিনক্ষন আমার মনে নেই। কারণ, আমি নিজেও জানতাম না রিয়ার সাথে আমার ফ্রেন্ডশীফের মত একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এবং যোগাযোগটা এত দীর্ঘ হবে। সে থেকে অদ্যবধী রিয়ার সাথে আমার নিঃছিদ্র, নির্মল এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় আছে। সেই সাথে মোর্শেদের সাথে অটুট রয়েছে তাদের ভালোলাগা-ভালোবাসার সম্পর্ক।

আমার জানুর অসুস্থতার সময়ে আমি আমার কর্মস্থলে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, মেইলটা চেক করতে পারিনি কত দিন ধরে, তাই মেইল করতেও পারিনি। আমি জানতামনা মেইলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে খুবই সুখকর একটা খবর। মেইল না দেখেই আমি "প্রভা" কে ফোন করে ধমকের সুরে বলি তুমি অসুস্থ আমাকে বলনি কেন? ওই দিন "প্রভা"র কণ্ঠে ছিল অনেক আবেগ, অনেক আদর, অনেক ভালোবাসা। আমি মনে করেছিলাম হয়তঃ অসুস্থতার কারনে ওর কথা এমন শোনাচ্ছে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় আদর জড়ানো কণ্ঠে কথা বলছে আমার জানু। আমার জানু আমাকে বলে, আমি যদি তোমাকে বলতাম আমি অসুস্থ, তাহলে কি তুমি চলে আসতে আমার কাছে? আমি তোমার কে? কেন তুমি জানতে চাও আমার অসুস্থতার কথা? আমি রীতিমত গাবড়ে গেলাম, "প্রভা" এমন ভাবে কথা বলছে কেন? ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি এমন ভাবে কথা বলছ কেন? তোমার কি হয়েছে? সামান্য একটু জ্বর, এতে এত ভয়ের কি আছে? আর এ কথা বলতে না বলতে "প্রভা" ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল তুমি কবে আসবে আমার কাছে, আমি যে আর পারছিনা, তুমি কেন

বুঝতে চাইছনা আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি। আমি নির্বাক, কি বলব আমি তাকে, সে কি শুনবে আমার কথা! আর যদি শুনেই থাকে তাহলে কি হবে তার প্রতিক্রিয়া? আমিতো পারবনা তার সাথে প্রতারনা করতে।

মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই "প্রভা" সুস্থ হয়ে উঠল। আমারও কাজের চাপ কমতে থাকল। অফিসে কাজের চাপ কমার পর আমি মেইল চেক করলাম, দেখি অনেকগুলো মেইল জমা হয়ে আছে, সর্ব প্রথম আমার "প্রভা"র মেইলটা আমি ওপেন করলাম। দেখলাম কতটা বিশ্বাস নিয়ে আমার "প্রভা" আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার পথের পানে চেয়ে আছে। কখন যে, এত বিশ্বাস এবং ভালোবাসা তৈরী হল ওর মনে আমি নিজেও জানিনা। "প্রভা"র সমস্ত কথাগুলো আমি দুষ্টমি মনে করতাম কখনো আমি সিরিয়াসলি নেইনি। কিন্তু আজকের এই মেইল! এই মেইলতো আমি অস্বিকার করতে পারিনা। অসুস্থ অবস্থায় "প্রভা"র বলা কথাগুলো আমার স্মরন হতে লাগলো। কেন "প্রভা" ঐদিন এমন করুনভাবে আমাকে কথাগুলো বলেছিল।

এর কিছুদিন পর "প্রভা"র মাষ্টার্সের রেজাল্ট দিল, ও আমাকে ফোন করে বলে, জান আজকে আমার মনটা খুব ভাল, আচ্ছা কেন বলতো? আমিতো জানিনা ওর মন কেন এত ভালো আজ, ওকে বললাম আমি কি জ্যোতিষী যে বলতে পারব কেন তোমার মন বেশি ভাল, তুমি এমন ভাবে কথা বলছ কেন? "প্রভা"র কথা আমাকে বলতেই হবে, আন্দাজ করে হলেও একটা কিছু বলতে হবে। আমি কিছু বলতে পারলামনা। পরে "প্রভা" নিজেই বলেছে আজ মাষ্টার্সের রেজাল্ট দিয়েছে আমি সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি অর্থনীতিতে। এই প্রথম শুনলাম "প্রভা"র শিক্ষাগত যোগ্যতা কি! আমি ওকে কনগ্রাচুলেট করলাম, প্রতিউত্তরে "প্রভা" ধন্যবাদ দিল এবং জানতে চাইল তুমি কবে আসবে দেশে?

কিভাবে বলি আমি দেশে আসলে কি হবে? আমি দেশে আসলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? আমি জানি "প্রভা" বাস্তবতার মুখোমুখি হয়নি এখনো। আমি ওকে অনেক বার বলেছি বাস্তবতা বড় কঠিন এবং নির্মম। আবগের পাখায় ভর করে বাস্তবতার নদী পাড়ী দেওয়া যায়না। তাই যে কোন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা ভালো বা থাকতে হবে। ও জানেনা আমার ক্ষেত্রে বাস্তবতা কি! যেদিন থেকে জানবে, সেদিন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, এটা আমি আন্দাজ করতে পারি। যে যতই ভালোবাসুক, এখন ভালোবাসার ক্ষেত্রে হিসেব-নিকেশটা বেশি হচ্ছে। আগে প্রেম-ভালোবাসার অংক যদি ঐকিক নিয়মে কষত, এখন ক্যালকুলাস নিয়ে বসে যায়। যার কারণে ভালোবাসা এখন তার আগের রূপ হারিয়ে নতুন রূপে আবির্ভুত হয়েছে।

এ সব কিছুই যুগের পরিবর্তন! সাধারণ টাইপরাইটার এখন আর ব্যবহার হচ্ছেনা। কারণ, এখন লেটেষ্ট টেকনোলজি, কম্পিউটারের যুগ। কালের আবর্তনে সব কিছুতেই পরিবর্তনের হাওয়া। প্রেম ভালোবাসা এ আওতার বাইরে থাকবে তাতো হয়না। আমি বাস্তবতাকে অস্বিকার করিনি কোন দিন। এই ক্ষুদ্র জীবনে মুখোমুখি হয়েছি অনেক কঠিন-কঠিন বাস্তবতার। তাছাড়া দীর্ঘদিনের প্রবাস জীবন এর ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী এবং আরো মজবুত করে দিয়েছে।

আমার মনে হল এখই সময় ওকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাড় করানোর। আমি এও জানি খুব দ্রুত পাল্টে যাবে দৃশ্যপট, এক সহজ সরল আত্মকাহিনী বদলে দিবে সব সমীকরন। বদলে দিবে সব আবেগ আর উচ্ছাস। বাস্তবতার কাছে জিম্মি হয়ে যাবে সব কিছু...।

((চলবে))

ঘরে বসে আকাশ দেখব।

॥॥ সাইফ মুন্না ॥॥

শহর থেকে দুরে সবুজের সমারোহ ঘেরা ডাকতিয়া নদীর তীর ঘেঁষে অমি'দের গ্রাম। গ্রামের তিন দিকেই ডাকাতিয়া নদী। শান্ত এই নদী গ্রামের সৌন্দর্য্যকে বাড়ীয়ে দিয়েছে বহুলাংশে। অবশ্য, এখন আর ঐ নদী আগের মত নেই। এক রকম খালে পরিণত হয়ে গেছে। এখনের ডাকতিয়া, মরা নদী। অমি'দের গ্রামের নাম **জঙ্গাল পুর**। শুনে অনেকেরই মনে হবে হয়তঃ আগে কোন জঙ্গাল ছিল, ঐ জঙ্গাল পরিষ্কার করে বসবাস শুরু করে মানুষ। যদিও এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু, আশির দশকে দু'টি হিংস্র বন্য প্রানী এসে সাত-আট ঘন্টার তান্ডবে পুরো গ্রাম লন্ড-ভন্ড করে দিয়ে মানুষের ধারনাকে মজবুত করে দিয়ে যায়। ঐ দিন অমিদের গ্রামের দশ-বারটি নলকূপ সহ অসংখ্য মানুষ এ হিংস্র প্রানী দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রানী গুলো দেখতে অনেকটা মহিষের আকৃতির। কিন্তু, আকারে এবং হিংস্রতায় অনেক বেশি এগিয়ে। ঐ বন্য প্রানী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন পঙ্গু অবস্থায় থেকে অমি'র দাদা অবশেষে মৃত্যু বরণ করেন। গ্রামের মানুষের সারা দিনের প্রচেষ্টার পরেও বন্য প্রানীগুলোকে ধরা বা মারা যায়নি। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে গুলি করে অনেকটা মুমূর্ষ অবস্থায় জবাই করা হয়। এর মধ্যে একটি গ্রামের মানুষ নিয়ে যায়, অন্যটি থানা কতৃপক্ষ নিয়ে যায়। আজও গ্রামের মানুষ ঐদিনটির কথা ভুলতে পারেনি। এর পর থেকে এ ধরনের কোন ঘটনা অদ্যবধী ঘটেনি। বর্তমানে অমি'দের গ্রামের অবস্থা আশ-পাশের দশ গ্রামের চাইতে ভাল। ডাকাতীয়ার তীরে যেন আরেক গুলশান-বনানী। কারুকার্য খচিত বাড়ীর মুল ফটক গুলো পথচলা যাত্রীদের নজর কাড়ে। অমি তার প্রেয়সীকে উদ্দশ্য করে লিখেছিল--

ডাকাতীয়া নদী আর জংগল পুর
কি সুন্দর মিল কি সুমধুর,
ভালবাসার পুণ্য ভুমি এই জংগল পুর
এখানে আসতে ব্যাকুল সুন্দরী আর হুর।
গ্রামতো নয়, যেন পর্যটন
এখানে আসলে জুড়ায় সবার মন,
সংস্কৃতি আর রাজনীতিতে সরগরম বটতলা
সকাল থেকে বৈরী ভাব, জমজমাট গোধুলী বেলা।
মুক্তিযোম্ধা নুরুর দোকান যেন উত্তাল সংসদ
যুক্তি-তর্কে হেরে গিয়ে কেউ করে গদ গদ
বল তুমি আসবে কবে আমার এই গাঁয়ে
দু'জন মিলে গল্প করব কৃষ্ণচুড়ার ছায়ে।
আসবে তুমি লাল শাড়ীতে, বাজবে বাজনা গান
তুমি শুধু আমার হবে ও আমার জান?

অমি, ছোট বেলা থেকেই একটু চঞ্চল। বন্ধু বান্ধব নিয়েই তার আড্ডা ছিল সব সময়। স্কুল জীবন থেকে শুরু করে কলেজ জীবন, কলেজ জীবন থেকে কর্ম জীবন। তার বন্ধুর সংখ্যা অগুনতি। বন্ধু প্রিয় মানুষ ভালো হয় শুনেছি। অমিও তার ব্যতিক্রম নয়। অমি'র জীবন ধারা যে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু না, চাইলেও কেউ অমির মত হতে পারেনা। আর পারবে বলেও মনে হয়না। আসলে কেউই কারো মত নয়, প্রত্যেকেই তার নিজের মত।

অমি মাধ্যমিক শেষ করেছে দু' স্কুল থেকে। প্রথমে এক স্কুলে দুই বছর অধ্যায়ন করার পর অন্য স্কুলে এসে ভর্তি হয়। অমি পরে যে স্কুলে এসে ভর্তি হয়, অমি'র বড় ভাইও একই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পাশ করেছে। অমিকে অন্য স্কুলে দেওয়াটা ছিল অমির বাবার একটা অসম্ভব ভালো রকমের বুদ্ধি। অমির বাবা মনে করতেন দুই ছেলেকে দুই স্কুলে দিলে একজনের কারণে অন্য জনের পরিচিতি বাড়বে। আসলে হয়েছেও তাই। অমিদের গ্রামে তাদের একটা ভালো অবস্থান। অমির বাবা এবং চাচা দুজনেই গ্রামের প্রভাবশালী ব্যাক্তি। অমির বাবা আর চাচার প্রভাবের কারণ, উনারা সব সময়ে সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন। কখনো হীন উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেননি। ভিলেজ পলিটিক্সের কূ' মন্ত্র উনাদের ছিলনা। পুরো গ্রামের মানুষ উনাদেরকে সমীহ করে চলেন। শুধু তাদের গ্রাম নয়, আশে পাশের অনেক গ্রামেই অমিদের নাম ডাক আছে। পারিবারিক স্বচ্ছলতা আছে অমিদের। বাবার ব্যবসা বানিজ্য আছে। তাছাড়া অমির বড় ভাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

অমি যখন অষ্টম শ্রেনীতে এসে ভর্তি হয় ঠিক ঐ বছরই তিনটি ছেলে নিউ কামার হিসেবে আসে একি ক্লাসে। এর মধ্যে একজন অমিদের গ্রামেরই ছেলে। কিন্তু, ওর সাথে অমির তেমন কোন জানা শোনা ছিলনা। ছেলেটি অমির আত্মীয় (ভাগিনা)। ওরা অনেক বছর যাবত ঢাকায় বসবাস করার কারণে অমির সাথে ওর ভাগিনার তেমন কোন সম্পর্ক ছিলনা। তাছাড়া ছেলেটা ছিল একটু বখাটে টাইপের। গ্রামে পা রাখার পর থেকেই শুরু হয় যত রকমের অরুচিকর কান্ড কারখানা। প্রথম দিকে গ্রামের সাধারণ মানুষ এদের জ্বালায় অতিষ্ঠ ছিল। কত রকমের বিচার শালিশ। কে শুনে কার কথা! পরে অবশ্য ধীরে-ধীরে সব কিছু প্রশমিত হতে থাকে। শহরের গলির মধ্যে বড় হওয়া সজল (অমির ওই সহপাঠি ভাগিনার নাম সজল) গ্রামে এসে দিশে হারা হয়ে যায়। এত খোলা মেলা জায়গা, মাথা ঠিক থাকেনা ওদের! ওরা আগে দু' এক বছরে গ্রামের বাড়ীতে আসে, তাও স্বল্প কিছু দিনের জন্য।

তখন অমির সাথে সজলের তেমন একটা মেশা হয়নি। কিন্তু, কাকতালীয় ভাবে একই বছর একই স্কুলে যখন ভর্তি হল, তখন দু'জনেই আশ্চর্য্য! কিন্ত, হলে কি হবে? সজল যে নিয়মিত স্কুল করেনা। অমি নিয়মিত স্কুলে করে। যদিও কখনো সখনো স্কুল মিস হত, তা একমাত্র ফুটবল খেলার জন্য। অমি অসম্ভব ভালো ফুটবল খেলত। আশপাশের গ্রাম গুলোতে তাই অমির আলাদা একটা পরিচিতি ছিল। তখন অবশ্য ক্রিকেটের এমন জয় জয়কার ছিলনা। অমি এই ফুটবল খেলার জন্য স্কুল কামাই করত আর শিক্ষকের বকুনী খেত। শিক্ষকরা অমিকে খুব পছন্দ করত। এর দুটা কারণঃ **(এক).** অমি পড়াশোনায় ভালো ছিল **(দুই).** অমি ভালো ফুটবল খেলত। স্কুলে যদিও অমিকে শিক্ষকদের বেতের আঘাত খেতে হয়নি। বাড়ীতে কিন্তু ঠিকি বাবা-মায়ের হাত থেকে অমির নিস্তার ছিলনা। অমিদের বাড়ীর নিয়ম ছিল,

মাগরীবের আযানের সাথে-সাথে পড়ার টেবিলে বসা চাই। অমিদের পরিবার খুবই রক্ষনশীল। বাড়ীর নিয়ম কানুন গুলো অত্যন্ত কড়া ছিল। অমিদের বাড়ী থেকে কড়া নির্দেশ ছিল, অমি যাতে সজলের সাথে না মিশে। কারণ, নানা মুখি দুর্নামের কারণে সজল তখন বিতর্কিত, আর তাই অমির পরিবার চাইতনা অমি সজলের সাথে মেলামেশা করুক। অমির বাবার ভয় ছিল অমি না আবার সজলের সংস্পর্শে খারাপ হয়ে যায়। তাহলে বংশের মান ইজ্জত যাবে। কিন্তু, অমি আর সজলের ইতিমধ্যে দারুন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অমি সজলকে ছাড়া, সজল অমিকে ছাড়া কিছু বুঝেনা। যেদিকেই যায় ওরা দু'জন একসাথেই যায়। আর এ জন্য অমিকে অনেক শাস্তিও পেতে হয়েছে পরিবারের কাছ থেকে।

অমি যখন অষ্টম শ্রেনীতে ভর্ত্তি হয় এর কিছুদিন পরেই অষ্টম শ্রেনীর বৃত্তি পরিক্ষার প্রস্তুতিমূলক ক্লাস শুরু হয়। যেদিন অষ্টম শ্রেনীর বৃত্তির জন্য প্রধান শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রী বাছাই করেছেন সেদিন প্রথম বাছাইয়ে অমি ছিলনা। এ নিয়ে সহপাঠিদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিল অমি। কিন্তু অমি জানতনা অমির সিলেকশান আগেই করা ছিল। প্রধান শিক্ষক আগেই অমির বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলে অমির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। অমি ব্যাপারটা জানতনা। প্রধান শিক্ষক যাদেরকে বাচাই করেছেন তাদের সবাইকে অফিস কক্ষে যেতে বলা হয়েছে তৎক্ষনাৎ। অমি দেখল ভাল ছাত্র/ছাত্রীদের মোটামোটি সবার ডাক পড়ল। অমি তখন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে ছিল, বড় ধরণের একটা হতাশা লক্ষ্য করা গেছে অমির মাঝে। এটা অমির আত্ম সম্মানে বড় ধরনের আঘাত। স্কুল ছুটির পর অমি যখন বাড়ীতে যায় তখন অমির বাবা অমিকে অষ্টম শ্রেনীর বৃত্তি পরীক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। অমি অবাক হয় তার বাবার কথায়! অমি'র অবাক হওয়ার কারণ, আজি স্কুলে কথা হল, কিন্তু বাবা ব্যাপারটা জানল কি করে। পরে অমির বাবা অমিকে সব বুঝিয়ে বলল। অমি বাবার কথাতে সম্মতি জানাল।

গ্রামের স্কুল হলেও নতুন আগতদের একটু সমস্যা হবেই। কিন্তু, অমির ব্যাপারে সমস্যাটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। প্রথম দিকে তার সহপাঠি ছেলেরা যতনা খারাপ আচরণ করেছে তার চাইতে বেশি করেছে মেয়েরা। অমি ক্লাস রুমে বই খাতা রেখে যদি কোন দিকে যেত ফিরে এসে দেখত কিছু একটা নেই। কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করে না পেয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকত। দেখা গেছে কয়েক ঘন্টা পরে একটা মেয়ে এসে বই বা খাতাটা ফেরত দিয়ে বলে এই নিন, আমি পড়তে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথম থেকেই এসব কান্ড গুলো নিয়মিত চলতে থাকল। আবার কোন সময় এসে দেখত, অমির বইগুলো আর টেবিলে নেই। পড়ে আছে টেবিলের নীচে। অমি ভিষন বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল শিক্ষকের কাছে নালিশ করবে। যেই কথা, সেই কাজ। একদিন অমি ফিরে এসে দেখে বইগুলো টেবিলের নীচে। অমি বই গুলো তুললোনা যতক্ষন না ক্লাসে শিক্ষক এল। শিক্ষক এলে অমি তার অভিযোগ জানায়।

কিন্তু, শিক্ষকের কথায় অমি হতাশ হল। শিক্ষক মহোদয় অমিকে বললেন- সহপাঠিরা এই রকম একটু দুষ্টমী করেই। শিক্ষক মশাই সবাই কে হাল্কা ধমকের সুরে বললেন সাবধান তোমরা আর এ রকম করোনা। ক্লাস যখন শেষ হলো সবাই অমিকে নিয়ে হাসতে লাগল এবং বলতে লাগল শিক্ষকের কাছে নালিশ করে কি লাভ হলো? এখন থেকে মজা বুঝাব! এ সমস্ত কথা বলে সবাই সমস্বরে হাসতে থাকে আর চেচামেছি করতে থাকে। এ অবস্থায় অমি অনেক বিরক্ত হয়। অমি কি করবে বুঝতে পারেনা। এর প্রতিকার কি তাও জানেনা। অমি চিন্তা করে তিন জন নতুন ছাত্র। কিন্তু, কাউকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, শুধু তাকে নিয়ে এতো সমস্যা কেন? (!) অমি ফের সিদ্ধান্ত নিল, ওদের যা খুশি মন চায় করতে থাকুক, অমি আর এর প্রতিবাদ করবেনা। অমি শুনেছে শহরের স্কুল গুলোতে নতুন ছাত্ররা পুরোনোদের দ্বারা র‌্যাগিংয়ের স্বিকার হয়। কিন্তু, অমি এটাকে পুরোপুরি র‌্যাগিংয়ের খাতায়ও ফেলতে রাজি নয়। অমি এ ঘটনাগুলো কাউকে বলতেও পারেনা। যে কি করা যায় বা কি করা উচিৎ।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। অষ্টম শ্রেনীর প্রায় শেষের দিকে ধীরে-ধীরে সব পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে। ধীরে-ধীরে অমি সবার কাছে জনপ্রীয় হতে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে অমির সহপাঠি দু'তিন জন মেয়ের অবদান ছিল বেশি। ওরা কোন একটা সময়ে এসে অমির পাশে দাঁড়ায়। অমি নিজেও বিস্মিত ছিল! কয়েক মাস আগেও যে মেয়েগুলোর কাছে অমি ছিল চক্ষুশূল, আজ ওরাই...। অষ্টম শ্রেনী থেকে নবম শ্রেনীতে উত্তীর্ন হওয়ার পর সব কিছু অমির অনুকূলে চলে আসে। এখন আর অমি দু'তিন জনের মধ্যে সিমাবন্ধ নেই। শুধু দু'তিন জন ছেলে সহপাঠি ছাড়া বাকীরা অমির সাথে খুবই বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করে। যে ছেলে গুলো এখনো অমিকে মেনে নিতে পারেনি, তা এক ধরনের জেলাসীর কারনে। এদের জেলাসীও বেশিদিন ছিলনা। সফলতার সাথেই অমি সবার প্রীয় অমি হয়ে যায়। স্কুল জীবনে অমির সবচে স্মরনীয় ছিল শেষের দিনটি। যেদিন বিদায় বেলায় অমির সহপাঠি মেয়ে গুলো অমিকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ ঘটনা কারো চোখ এড়ায়নি। অমি ছিল হতবিহ্বল। বাক শক্তি ছিলনা অমি'র। কাকে কি বলতে হবে, বা নিজে কি করবে। অমি নিজেও অনেক কেঁদেছিল। এমন ভালবাসা কয়জন অর্জন করতে পারে।(?)

এস এস সি পাশ করার পর অমি চলে যায় চট্রগ্রামে বাবার কাছে। যেখানে অমিদের ব্যবসা বানিজ্য আছে। অমির বাবার ও ইচ্ছে ছিল অমিকে ভাল কোন কলেজে দিবে। তখন গ্রাম থেকে পাশ করে শহরের কলেজে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। অমির এস এস সির রেজাল্ট ভাল দেখে অমির বাবা আরো সাহস পায়। অমির মতামতের উপর ভিত্তি করেই অমিকে ভর্ত্তি করিয়ে দেয় চট্রগ্রামের নাম করা একটি কলেজে। শুরু হয় অমি নতুন পথ চলা। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই অমি অনেকের নজরে আসে। সহপাঠিতো বটেই, সিনিয়রদের মাঝেও অমিকে নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ছয় মাসের মাথায় অমি চলে আসে সবার আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে। রেসিডেন্সিয়াল কলেজ হওয়াতে প্রত্যেক বর্ষে সরাসরি ভোটে শ্রেনী 'ছাত্র প্রতিনিধি' নির্বাচন হয়। সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে অমি প্রথম বর্ষে প্রথম 'ছাত্র প্রতিনিধি' নির্বাচিত হয়। এর পর আর অমিকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। দ্বিতীয় বর্ষেও অমির একই অবস্থান থাকে। দ্বিতীয় বর্ষে এর সাথে যোগ হয় নতুন আর এক সাফল্যের। দ্বিতীয় বর্ষে থাকা কালীন অমি একটি রাজনৈতিক সংঘঠনের কলেজ শাখার সাধরণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। এই বিজয় অমিকে কলেজ আঙ্গিনা ছেড়ে বাহিরের রাজনৈতিক অঙ্গান পর্যন্ত স্পর্ষ করে। বেড়ে যায় অমির ব্যস্ত তা।

পড়াশোনা ছেড়ে বিভিন্ন কারণে এদিক ওদিক দোড়াদোড়ি অমির নিয়মিত কাজ হয়ে দাড়ায়। কোথায় সন্ধ্যা, কোথায় রাত, কোথায় সকাল কোন কিছুরই আর ঠিক থাকেনা। প্রথম দিকে যে রকম অমি মাস শেষ হলেই মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য চটপট করত, আজ সেই অমি মায়ের কাছে যাওয়ার কথা ভুলেই গেছে। নিজের ব্যস্ততার কোন কিনারা করতে পারছেনা। কাছাকাছি থাকা বাবা-ভাইদের সাথে দেখা করার ও সময় মেলেনা অমি'র! এ অবস্থাতে অমির বাবা অমিকে নিয়ে খুবই শংকিত। অমির বাবা রাজনীতির চক্কর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক তাগাদা দিয়েছে অমিকে। যতবার বলেছেন, ততবারই অমি বাবাকে আশ্বস্ত করেছে যে খুব কম সময়ের মধ্যেই এসব

ছেড়ে দিবে। কিন্তু, কাজের কাজ কিছুই হলোনা। কেটে গেল দ্বিতীয় বছরটিও। অমি পা রাখল তৃতীয় বর্ষে। অমি আর অমিতে নেই। রাজনৈতিক চতুরতায়, বাক পটুতায়, এবং পরিপক্বতার কারণে অমির এখন স্বর্ন যুগ।

তবে অমির ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষনীয় ছিল। অমির নারী দুর্বলতা ছিলনা এবং কলেজ জীবনের গতানুগতিক প্রেম ভালোবাসায় কখনো জড়ায়নি অমি । দ্বিতীয় বর্ষে থাকা অবস্থায় সুমি নামের একই কলেজের একটি মেয়ে অমিকে প্রথম প্রপোজ করে। সুমি ছিল প্রথম বর্ষের। প্রথমে অমি আশ্চর্য্য হয়, সুমির সাহস দেখে। অবশ্য এর আগে সুমি কয়েকবার অমির সাথে কথা বলেছে। অমিকে কখনো একা-একা দেখলেই পেছন থেকে অমি ভাইয়া-অমি ভাইয়া বলে ডাক দিয়ে দোড়ে কাছে গিয়ে বলে-আপনি কেমন আছেন? এ কথা শুনে অমি নিঃশব্দে হাসে। অমি বুঝতে পারে সুমি কি বলতে চায়। সুমিও জানে অমি কেন হাসছে। অমি জিজ্ঞেস করে, তুমি কেমন আছ? তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে? ঠিক যেন বড় ভাইয়ের মত আচরণ। সুমি নিচের দিকে তাকিয়ে পা দিয়ে মাটি খোঁচায় আর নিজের অবস্থান বর্ননা করে। এর পরই অমি পরে কথা হবে বলে সামনের দিকে পা বাড়ায়।

সুমি কিছু বলতে চেয়েও পারলনা। ততক্ষনে অমি চলে গেছে। সুমি সব সময় মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখে যে, সুযোগ পেলেই বলে ফেলবে। আর তাই মনে হয় সুমি'র সুযোগটাও আসে কম। কারণ, অমির সাথে সব সময় দু'চার জন থাকেই। কখনো সখনো যদিও একা দেখা যায়, কিন্তু চলার গতি দেখলে আর ডাকার ও ইচ্ছে হয়না সুমি'র। অনেক রাগ হয় সুমি'র। অনেক সময় সুমি ভাবতে থাকে যে, এ কি মানুষ? না কোন মেশিন! যখন দেখি ধুমকেতুর বেগে চলে। আবার অনেক সময় সুমি'র গর্ব হয় যে, ওর পছন্দের মানুষটির সব কিছুতে অমন ধুমকেতুর বেগে চলা দেখে। মনে কত কল্পনা, কত স্বপ্ন বাসা বাধে সুমি'র। কিন্তু, সুমি কি জানে, অমি সুমি কে নিয়ে ভাবার সময় পায়না। না, তারপরও সুমি'র আশায় এতটুকু ছিড় ধরেনা। সুমি'র ধারণা আজ নয়তো কাল অমি ঠিকি সুমি'র দিকে তাকাবে। সুমি অমির আরেকটা বিষয় নিয়ে বিস্মিত হয়। যে মানুষটির এত ব্যস্ততা সে মানুষ পড়াশোনা করে কখন। পাশ ই বা করে কিভাবে। শিক্ষকরা ডরে ভয়ে ওকে পাশ করিয়ে দেয়নাতো? এই প্রশ্ন যে শুধু সুমি'র মনে ঠিক তা নয়। এ রকম শত ছাত্র/ছাত্রীর মনে একই প্রশ্ন। কিন্তু, কেউ সাহস করে এ ব্যাপারে কথা বলেনা।

অমির দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরিক্ষার আগে একজন নতুন শিক্ষক এলেন কলেজে। কিছু দিনের মধ্যে অমির ব্যাপারে জানাশোনা হয়ে গেল স্যারের। যতই গুন গান করুক, যে ছাত্র পড়াশোনা করেনা সে পাশ করে কিভাবে। নতুন শিক্ষকের ও ধারণা যে অমিকে এমনিতেই স্যাররা পাশ করিয়ে দেন। নতুন স্যার ছিলেন তাবলীগ জামাত পন্থি, এরা একমাত্র আল্লাহ কে ছাড়া কাউকে ভয় করেন না। এমন ব্রত থাকে তাবলীগীদের। স্যার সিদ্ধান্ত নিলেন এবার পরিক্ষায় তিনি অমিকে পর্যবেক্ষন করবেন সার্বক্ষনীক। স্যারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেনি কেউ। দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরিক্ষা যথারীতি শুরু হল। রাকিব স্যার আছেন অমিকে নিয়ে। কিন্তু না, স্যারের ধারণা ভুল ছিল। অমি তার স্বাভাবিক নিয়মে পরিক্ষা শেষ করে। অমির স্বাভাবিকতা দেখে রাকিব স্যার যেমনি বিস্মিত হয়েছেন তেমনি স্যারের ভুল ধারনাটাও ভেঙ্গে গেছে। অমি সাধারণতঃ শেষ রাতে পড়তে বসে। নিঃশব্দে তির-চার ঘন্টা পড়াশোনা করে শুয়ে পড়ে। কোন কাজ না থাকলে ঘুম ভাঙ্গলেই উঠে। কাজ থাকলে কাউকে দায়িত্ব দেয় জাগিয়ে দিতে। শেষ রাতে পড়ার কারনে তেমন কেউ অমিকে পড়ার টেবিলে দেখেনা।

তৃতীয় বর্ষে এসে সর্ব প্রথম অমি রাজনৈতিক মামলায় তিনদিন জেলে ছিল। জেল থেকে বের হয়ে অমি অনেকটা দুর্দর্ষ হয়ে উঠে। শুরু হয় অমির আরেক জীবন। আর ভাল ভাবে পড়াশোনায় মন বসেনা। সব কিছু কেমন জানি অগোছালো লাগে। আর একটা বছর কিভাবে শেষ করবে সে নিয়ে অনেক চিন্তা। এদিকে প্রতিপক্ষের সাথে প্রতি নিয়ত স্নায়ু যুদ্ধ। কখন কি হয় বলা য়ায়না। সুমি একদিন দুপুর বেলায় অমির কাছে আসে। সুমি কে দেখে অমির চোখে মুখে এক রকম বিরক্তির চাপ। অমি সুমিকে সহ্য করতে পারছেনা। অমির এ অবস্থা দেখে সুমি কিছু বলতে গিয়েও কেঁদে ফেলে। সুমি'র কান্না দেখে অমি উত্তেজিত হয়ে ওর রুমে আসার কারণ জিজ্ঞেস করে। সুমি নিজেকে সংযত করে অমি কে বলে আমি আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু, সময় সুযোগ করে এ পর্যন্ত আমার বলা হয়নি। আজ আপনার এই অবস্থা দেখে নিজেকে আর সংযত করতে পারলাম না। তাই আপনার রুমে এসেছি।

সুমি'র কথা শুনে অমি অগ্নিমুর্তি ধারন করে রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলে সুমিকে। সুমি কাঁদতে-কাঁদতে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। কি করবে অমি বুঝতে পারছেনা। সেদিন আর অমি রুম থেকে বের হলোনা। এখন অমির সব আচরণ সবার কাছে নতুন লাগে। দু'দিন পর অমি সিদ্ধান্ত নিল সুমি'র সাথে কথা বলবে। সুমি কে খরব দিতে পাঠাল একজন কে। কিন্তু, সুমি নেই। গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছে। এ খবর অমিকে অনেক মর্মাহত করে। অমি চিন্তা করে ঠিক করল যেভাবেই হোক সুমির সাথে কথা বলা দরকার। ওর বান্ধবীর কাছ থেকে ওদের গ্রামের বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করে অমি ওদের গ্রামের বাড়ী চলে যায়। অমিকে দেখে সুমি ভুত দেখার মত চমকে উঠল। অমিকে কলেজের বড় ভাই বলে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দিল সুমি। অমি সুমি'র কাছ থেকে পনের মিনিট সময় চাইল। সুমি'কে অমি তার ভালবাসা প্রত্যাক্ষান করেছে এমন কথা বলেনি। কিন্তু, অমি যে বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে তা বুঝাতে চেয়েছে। অমি বলেছিল, তোমার প্রতি যে, আমার দুর্বলতা নেই এ কথা বললে ভুল হবে। কিন্তু, এক বছর আগেও যে অমিকে তুমি দেখেছ সে অমি এখন নেই। ভুল পথে পা দিওনা। আমার গন্তব্য বন্ধুর। কোথায় গিয়ে শেষ হবে আমি জানিনা। এই কথা বলে অমি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

কলেজের হোস্টেলে ফিরে এসে কিছু কাপড় নিয়ে অমি চলে যায় গ্রামের বাড়ীতে। বহু দিন পর অমিকে কাছে পেয়ে মা অনেক আবেগ আপ্লুত হয়। অমি যে শুকিয়ে গেছে মা তা লক্ষ্য করেন। পড়া-শোনার চাপে অনিয়মিত ঘুমের কারণে এমন হয়েছে বলে মাকে বুঝিয়ে দিল। কিছুদিন গ্রামে থেকে অমি আবার ফিরে যায় কলেজে। কিন্তু, বিধিবাম। অমির ভাল লাগেনা। অমি কলেজে ফেরার দশদিনের মাথায় ঘটে গেল আরেকটি রাজনৈতিক দাঙ্গা। এবার নেতৃত্বে স্বয়ং অমি। ঐ ঘটনার পর অমি আর কলেজে ফিরে গেলনা। চলে গেল রাজশাহী মামার কাছে। কিন্তু না, ওখানেও অমির ভাল লাগছেনা মামাকে বলে গ্রামে ফিরে যাবে। মামা বল্লেন কলেজে ফিরে যেতে। অমি আর কলেজে যাবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে। মামা-মামী অমিকে অনেক বুঝিয়েও কোন লাভ হলনা। কিছু দিন পর অমি মামাকে বলে আমাকে বিদেশ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, যে কোন দেশে। অমির মামা উনার এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে মাত্র ১০ দিনের মাথায় অমিকে পাঠিয়ে দিলেন মধ্যপ্রাচ্যে।

শুরু হয় অমির নতুন জীবন। কর্ম জীবন। কিন্তু, কি কাজ করবে অমি প্রবাসে? যে ছেলে জীবনে কাজ কি জিনিস বুঝতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছার কিছু দিন পর এক সময়ের বন্ধু রাসেলের দেখা পায় অমি। রাসেল গুনাক্ষরেও কল্পনা করেনি অমি বিদেশ আসবে, তাই দেখে একটু চমকে গেছে। অমিকে পেয়ে রাসেল বেজায় খুশি। রাসেল সাথে করে অমিকে নিয়ে গেল। দীর্ঘ এক বছর যাবত অমি

রাসেলের কাছেই ছিল। কোন কাজ কর্ম বিহীন। শুধু শুয়ে বসে খাওয়া, টিভি দেখা আর নেটে চ্যাটিং করা। এই ছিল রাসেলের বাসায় অমির কাজ। অবশ্য মাঝে মধ্যে এদিক সেদিক কাজ দেখা হয়েছে। কিন্তু, অমির কোন কাজ পছন্দ হয়নি। এক বছর পর অমি রাসেলকে জোর দিয়ে বলে কাজ ঠিক করেও দেওয়ার জন্য। রাসেল অমির জন্য আধা সরকারী একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ ঠিক করে দেয়। অমির ভাগ্য ভাল। যেমন চাকুরী, তেমনী সম্মানী। এ সবের জন্য রাসেলের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ অমি ।

কয়েক বছর ধরে চ্যাট করে অমি। কিন্তু না, চ্যাট রুমের চল-চাতুরী আর কলাকৌশলের প্রেম ভালোবাসায় অমি বিশ্বাস করেনা। তাই শুধু ফান বা মজা করার জন্য যা দরকার তাই করেছে সব সময়। দীর্ঘদিন ধরে চ্যাট করার কারণে অমির অভিজ্ঞতাও অনেক। অমি চ্যাট রুমের একটা ছক বাঁধা হিসেব করে। আর আধুনিক যুগের প্রেম ভালোবাসার সাথে ওই হিসেব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এখানে প্রতিনিয়ত জুটি হচ্ছে আর ভাঙ্গছে! নিজেকে অগোচরে রাখার সুযোগ থাকার কারণে এক একজন করছে একাধিক প্রেম। অনেকটা ফুটবল মাঠের মতো ছুটোছুটি। দু'মিনিট এখানেতো তিন মিনিট অন্যখানে। এখানে শিলা'তো, ওখানে মিলা। আবার এখানে রাহিল'তো, ওখানে রাহুল। একেবারে সস্তাদরের প্রেমের স্বর্গ রাজ্য এ সব চ্যাট রুম। একেই কি বলে আধুনিকতা? দৌড়া-দৌড়ী করে প্রেম করা আর প্রেমে পড়া!

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত অমিও ধরা পড়ল রুমার ফাঁদে। যে অমি এসব থেকে নিজেকে সবচেয়ে সাবধান ভাবত। সেই অমি মিথ্যে আলেয়ার পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে ঝড়ো বেগে ধাক্কা খেল! রুমার সাথে পরিচয়ের এক পর্যায়ে রুমা অমিকে ভালবাসার কথা বলে। অমির হাজার বার না সত্ত্বেও রুমা নাছোড় বান্দা। অমি যখন রুমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তখন রুমা আক্ষেপ করে বলেছিল, আমার ভাগ্যে সব ভিতু কাপুরুষ জোটে। অমি রুমাকে অন্য ছেলে দেখার কথা বলে, এবং কেন তাকে পছন্দ জিজ্ঞেস করাতে রুমা বলেছিল, এই মিথ্যে অহমিকার জামানায় তোমার মত কেউ আছে আমি ভাবতে পারেনি। অমি বার বার রুমাকে আবেগ সংবরন করার কথা বলেছে। অমিকে যখন কোন ভাবেই বশে আনতে পারছিলনা রুমা, তখন একজন কঠিন মানুষ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল অমিকে। তার জবাবে অমি বলেছিল-প্রেম ভালোবাসা নিয়ে যে কোন মেয়ে যত নান্দনিক কথাই বলুক, কোন শ্রেনীর মেয়েরা কি চায় এই জীবন দর্শনে অমি ভাল করেই জেনে নিয়েছে। চ্যাট রুমের প্রেম ভালোবাসা চলচাতুরী আর ভন্ডামী বৈ অন্য কিছু নয়। কিন্তু, ভালোবাসার নিখুঁত ফাঁদের জননী রুমা জানত কি ভাবে বশ করা যায়। তাই রুমা কোন কৌশল বাদ না দিয়ে আপ্রান চেষ্টায় অমিকে কুপোকাত করে।

রুমার ক্ষেত্রে অমির দুর্বলতা ছিল, সাজানো গোছানো কথা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, আর সাহিত্য রসে ভরা মেইল গুলি। অমি বেশি আশ্চর্য্য হত রুমার মেইল গুলি দেখে। একজন বাংগ্গালী মেয়ে দেশের বাইরে থেকেও এত সুন্দর করে বাংলা লিখতে জানে! রুমার ভাষা গত দক্ষতা ছিল অসাধারণ। অমি রুমার প্রত্যেকটা মেইলে বিস্মিত হত! রুমার প্রথম মেইলে অমিকে **'হ্যামিলনের বাঁশি ওয়ালা'** আখ্যা দিয়েছিল। লিখেছিল, অমি বাঁশি বাজাচ্ছে আর ও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছন পিছন ছুটছে। কোন-কোন মেইলের শিরোনাম ছিলো **'ওগো আমার মন মন্দিরের দেবতা'**। রুমার এ ধরনের বিস্মিত অসংখ্য সম্মোধন আছে যা অমিকে ভাবের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। রুমা এক মেইলে অমিকে লিখেছিল-'**তুমি যেখানেই থাক, যত দুরেই থাক, আমি থাকি তোমার হৃদয় মাঝে। তেমনি তুমি থাক আমার হৃদয়ে সকাল-দুপুর-সাঁজে**' । রুমা অমিকে কবিতার চারটি লাইন উপহার দিয়েছিল।

সন্ধ্যা তারা দেখেছি, দেখেছি নীল আকাশ।
দেখেছি অরন্য পর্বত মালা
দেখেছি সমুদ্র, দেখেছি তার ঢেউ
তোমার মত এমন করে ধরায়
কাছে টানতে পারেনি কেউ।

অমি আর্শ্চয্য হয়, রুমার লেখাগুলো দেখে। অমি মনে-মনে ভাবতে থাকে রুমা কি সত্যিই এই কথা গুলো উপলব্ধি করে? ধীরে-ধীরে অমি ঝুকতে থাকে রুমার দিকে। রুমা যখন বুঝতে পারল অমি রুমার টোপ গিলে ফেলেছে, ঠিক তখনি রুমা দ্রুত বেগে গতি রোধ করে। রুমা অমিকে বলে দেয় তার অনিশ্চয়তার কথা। রুমা শেষ গন্তব্যের অনিশ্চয়তার কথা বলে। অমি রুমার কথায় হতাশ হয়। কিন্তু, তার পরও রুমা অমিকে ধরে রাখতে চায়। কিছুদিনের মধ্যে অমি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক রুমার পথ অনুসরন করতে লাগল। অমি রুমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল:

মনের গহীনে জন্ম নেয়া ভালোবাসা
হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখেছে মাত্র,
হাটি-হাটি, পা-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে
কিছুদুর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়
হায়রে প্রেম আমার! গন্তব্য কোথায়?
আবেগ, অনুভূতি সবি আছে
মঞ্জিল নেই, তাই রাস্তাও মিলছেনা
এ কেমন চাওয়া, এ কেমন আবেগ?
যার নাম দিয়েছি ভালোবাসা!
যে ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পাবেনা
ভালোবাসার এই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ
সুস্থ্য মস্তিস্কের বিকৃতি বৈ অন্য কিছু নয়।
যে পা মাটি থেকে টেনে তোলা যায়নি
সে শরীর এখন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়!
কত সুন্দর এই দুনিয়া, আজব করে ফেল্লাম,
জটিল ভালোবাসার কুটিল চালে।
কি রেখে যাচ্ছি আমরা প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ,
চল-চাতুরী আর কলাকৌশলের ভালোবাসা।

এর মধ্যেই পরিবর্তন হতে থাকে রুমার। অমি ব্যাপারটা বুঝতে পারে, তাই রুমাকে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে বলে। রুমা অমিকে জানিয়ে দিল যে প্রেমের সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু, বিয়ে করা সম্ভব নয়! অমি হাসতে থাকে, অট্টহাসি। নিজেকে সামলে নিয়ে অমি শুধু বলেছিল, হায়রে মায়াবীনী, হায়রে মিথ্যে আলেয়া। ঘরে বসে আকাশ দেখতে চায়...

--সমাপ্ত--

বিঃদ্রঃ ইন্টারনেট টেকনোলজীর এই বিস্ময়কর যুগে, প্রতিযোগীতা করে বাড়ছে চ্যাট রুমের সংখ্যা। যেখানে বিনোদনের নামে ব্যায় হচ্ছে অর্থ, সময়, শ্রম এবং মেধা। এ্যালকোহলের মত নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে তরুন সমাজ। যেমন বলা হচ্ছে আনলিমিটেড ফানের কথা, তেমনি ছড়িয়ে যাচ্ছে আনলিমিটেড সাইবার ক্রাইম। দ্বন্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে একে অন্যের সাথে। এসব শিক্ষিত তরুন-তরুনীরা নিজেদের ব্যায় করা এই সময় থেকে এক তৃতীয়াংশ সময় মঙ্গলের কাজে, মানবতার কাজে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কাজে ব্যায় করলে উপকৃত হবে দেশ ও জাতি।

কবিতা গুচ্ছ।

নূপুরের শব্দ

রুম ঝুম-রুম ঝুম নূপুরের শব্দের মত
তোমার ঐ পাঘল করা হাসি
বিমুগ্ধ হয়ে আত্মার সাথে আলিঙ্গান করি।
এ কোন শব্দ তরঙ্গা!
যা আমার শিরা-উপশিরা-ধমনীতে
রিতিমত প্রলয় সৃষ্টি করে।
সব ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটিয়ে
প্রতিক্ষায় থাকি, কখন থামবে কোলাহল
কখন বাজবে আমার সেল ফোন,
কখন সেই যাদু মাখা কণ্ঠে বলবে
কেমন আছ তুমি?
বিলুপ্ত হয় সব, ভুলতে থাকি অনুভুতি।
তুমি আমার, শুধুই আমার,
এই ভাবনায় মগ্ন থাকি আমি
আমি মানতে পারবনা কোন অন্ধকারের হাত ছানি।
আমি ভুলতে বসেছি আমার চারিপাশ
কেন ভুলবনা অন্য সব?
তুমি যে, দাপিয়ে বেড়াচ্ছ আমার প্রতিটি রক্ত কনিকায়।

মনের দাবী

মাথাটা ঝিম ধরে যায়
আর ভাবতে পারিনা,
উদভ্রান্তের মত পথ চলা শুরু হয়ে গেছে
সরল কোন কিছু আর সরল থাকেনা।
বিলুপ্তি ঘটেছে অন্য সব অনুভুতির
আমি জানি, ফিরে পাবনা,
আমার সে চঞ্চল চটপটে দিন গুলি
হারিয়ে গেছে অতল গহ্বরে।
ট্রয় নগরী আর আগের মত নেই
হেলেনের স্বকীয়তায় ধ্বংস হয়ে গেছে।
আমার ধ্বংস ঠেকাবে কে?
যে জোয়ারে আমি ভেসে গেলাম
ফিরে কি পাব তীরের সন্ধান?
তুমিতো আমার মনের দাবী ছিলে
সে মন আজ হন্যে হয়ে খোঁজে তোমাকে।

অমানিশার অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে
বরষাতেই এসো, শ্রাবনের অঝোর ধারার মাঝে
আচ্ছন্ততা কেটে এক ঝিলিক রোদ হয়ে।
ফোটা কদম আর কামিনীর সৌন্দয্যের মাঝে।

গন্তব্য?

মনের গহীনে জন্ম নেয়া ভালোবাসা
হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখেছে মাত্র,
হাটি-হাটি, পা-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে
কিছুদুর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়
হায়রে প্রেম আমার! গন্তব্য কোথায়?
আবেগ, অনুভূতি সবি আছে
মঞ্জিল নেই, তাই রাস্তাও মিলছেনা
এ কেমন চাওয়া, এ কেমন আবেগ?
যার নাম দিয়েছি ভালোবাসা!
যে ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পাবেনা
ভালোবাসার এই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ
সুস্থ্য মস্তিষ্কের বিকৃতি বৈ অন্য কিছু নয়।
যে পা মাটি থেকে টেনে তোলা যায়নি
সে শরীর এখন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়!
কত সুন্দর এই দুনিয়া, আজব করে ফেল্লাম,
জটিল ভালোবাসার কূটিল চালে।
ভালোবাসাটা কি খেলনা, নাকি ফেলনা?
কি রেখে যাচ্ছি আমরা প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ?
চল-চাতুরী আর কলাকৌশলের ভালোবাসা?
এখন আর কোন সারেং গায়না,
ও রে নীল দরিয়া, আমায় দেরে দে ছাড়িয়া
আগের সেই সাম্পান আর নেই।
এখনের সাম্পান ইঞ্জিন চালিত প্রবল গতি বেগের।
প্রেমের সাম্পানের গতিও এখন অনেকটা তাই।

তোমার প্রত্যাবর্তন

মন চায় আবার পেছনে হাটি
ফিরে যাই নয় বছর আগের সীমানায়,
ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়ে
আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল কেউ।
ফিরতে চাই নাটকীয় ভাবে
যেমনি ফিরেছ তুমি নয় বছর পরে।
তুমি ফিরেছ,
হলিউড, বলিউড, ঢালিউড কে হার মানিয়ে।
তোমার এ নাটকীয় প্রত্যাবর্তন
আমাকে করে দিয়েছে এলোমেলো।
দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানটা হিসেব করি আমি
হিসেব করি আমার চাওয়া পাওয়াটা কি ছিল
হিসেব করি আমি, কেন হারিয়েছিলে তুমি।
হিসেব করি কেনই বা ফিরলে আবার আমার জীবনে।
আমার হিসেব এখন তোমাকে আগলে রাখার সমীকরনে
তুমি কি থাকবে আমার ঐকিক নিয়মে,
না, হয়ে যাবে ক্যালকুলাসের মত জটিল কোন কিছু?

মন থেকে চাইছি তোমাকে, আমার এই তারুন্যে।

প্রেম তুমি

প্রেম তুমি
আসলেই নেশা
তোমার কারণে,
আজ আমি পথ হারা
খুজে পাইনা কোন দিশা।।
তুমিতো এসেছিলে নয় বছর আগে
যখন আমার তারুন্য খুব দ্রুত ভাগে,
আমিতো চেয়েছিলাম তোমাকে আগলে রাখতে
আমার নিয়তি আমাকে দিলনা তোমার কাছে থাকতে।
প্রেম তুমি,
আবার এলে ফিরে
যখন আমি বসে আছি দুর বহু দুরে।
আসলে তুমি খুব দ্রুতবেগে
আমিতো মরেই গেলাম আবেগে।
আমার আবেগ আজ আমার দুশমন
সেতো হবেনা কোন দিন আমার প্রিয়জন।

তুমি এসো

তুমি এসো ভালোবাসার ছন্দ নিয়ে
তুমি এসো চৈতী ফুলের গন্ধ নিয়ে,
তুমি এসো আমার মন-মন্দিরে
এখানে রাখবো তোমায় বন্ধি-রে।
তুমি এসো আমার সুখের পরশে
তুমি এসো গাঁজা আর সরসে,
তুমি এসো বাসন্তি শাড়ীতে
তুমি এসো পরিপুর্ণ নারীতে।

তুমি এখন ঢাকায়

তুমি থাক ঢাকাতে, সাথে জুথি-বিথী
আমি থাকি প্রবাসে এ কেমন রীতি,
রড় কষ্ট তুমি ছাড়া এই মরুতে
জানিনা, বাঁচবো কি মরবো এই ধরাতে।
তুমি যদি থাক পাশে আমি হব সুখি
কথা দাও তুমি হবে আমার দুঃখে দুঃখি,
তুমি ছাড়া সব কিছু বড় এলোমেলো
তুমি এলে গুছবে সব আমার দুঃখ গুলো।
বল তুমি আসবে কবে আমার আঙ্গিনায়
তোমায় নিয়ে ভেসে যাব
সুখের অসীম সীমানায়।

ভালবাসার পুণ্য ভুমি

ডাকাতীয়া নদী আর জংগল পুর

কি সুন্দর মিল কি সুমধুর,
ভালবাসার পুণ্য ভুমি এই জংগল পুর
এখানে আসতে ব্যাকুল সুন্দরী আর হুর।
গ্রামতো নয়, যেন পর্যটন
এখানে আসলে জুড়ায় সবার মন,
সংস্কৃতি আর রাজনীতিতে সরগরম বটতলা
সকাল থেকে বৈরী ভাব, জমজমাট গোধূলী বেলা।
মুক্তিযোদ্ধা নুরুর দোকান যেন উত্তাল সংসদ
যুক্তি-তর্কে হেরে গিয়ে কেউ করে গদ গদ
বল তুমি আসবে কবে আমার এই গাঁয়ে
দু'জন মিলে গল্প করব কৃষ্ণচুড়ার ছায়ে।
আসবে তুমি লাল শাড়ীতে, বাজবে বাজনা গান
তুমি শুধু আমার হবে বুচ্ছ, আমার জান?

আমার ছন্দের পতন

তোমার চলে যাওয়ায় আমার ছন্দের পতন
তোমার ফিরে আসায় হলো তার অবসান,
আসা যাওয়ার এই খেলায়
কষ্ট হয় ভবের এই মেলায়।
মেলার রং যেমন, সকাল থেকে সাঁজে
রাতের বেলায় আমার হৃদয়ে বেদনার সুর বাজে,
শূণ্যতার এই বিশাল কষ্ট
আমাকে করে তোলে বেদনার্ত।
আমার স্বপ্ন গুলো কেন এমন হয়
তাসের ঘরের মত অচিরে ভেঙ্গে যায়,
শূণ্যতায় কল্পনার জগৎ নয়
পুণ্যতায় ফিরে এসো আমার মন মন্দিরে।

এখন আমি শান্তি চাই।

দিগন্ত থেকে দিগন্তে
ভাটি থেকে উজানে,
এপার থেকে ওপার
লোকালয় থেকে নির্জনে।
খুঁজেছি আমি তোমাকে
কোথায় ছিলে তুমি,
কেন পাইনি আমি তোমাকে
আমার যোগ্য সময়ে,
যখন আমি মরুভূমির উত্তপ্ত
বালুরাশীর মধ্যে অপেক্ষায় আছি তোমার
তীর্থের কাকের মত।
তখন আমার দু'চোখ থেকে আবিষ্কার করি
দু'ফোটা অশ্রু হাতের তালুতে।
ডুকরে কাঁদে আমার মন
এক অজানা শংকায়।
নীশীতে, শয়নে, স্বপনে আমি
শুনতে পাই ডাহুকের নিদারুন ডাক

মনে জাগে বিপদ শঙকুল
এক আগামীর হাতছানী।
তখন মনের অজান্তে বলে উঠি
আমি রেহাই চাই, আমি রেহাই চাই,
এখন আমি শান্তি চাই।

কি করে ভুলি তোমায়

জুলাই ৯৮' ভুলব কেমন করে
তোমার সাথে পরিচয় জানুয়ারীর পরে,
আশা নিয়ে সামনে গেলাম বন্ধুত্বের তরে
সে আশায় গুড়ে বালি সর্বনাশা ঝড়ে।
সম্পদ আর শিক্ষায় কি ভালোবাসা হয়?
লাইলী আর মজনু কি সে দীক্ষা নয়।
যুগের সাথে ভালোবাসার হলো সংস্কার
ভালবেসে আমি পেলাম দুঃখের অঙ্কার,
বলেছিলে বন্ধু হবে যদি না হও বউ
এখন তুমি কেউ রইলানা বুকে তুলে ঢেউ।
প্রবাস শুধু এখন আমার বোঝা মনে হয়
কি করলে বন্ধু তোমায় করতে পারব জয়,
থাক তুমি সুখে থাক এই দোয়া করি
আমি যেন প্রবাসেতে দুঃখে-দুঃখে মরি।

দুঃসহ যন্ত্রনা।

বুঝিনি আমি কেন থমকে গেল আমার পৃথিবী
অবাক হয়ে আন মনে ভাবতে থাকি আমি
ভুলটা কোথায় আমার
ভোঁতা হয়ে গেছে সব অনুভূতি।
স্বপ্ন ছিলনা কোন কালে
তাই উড়তে পারিনি রঞ্জিন দুনিয়ায়
বর্তমানই আমার সব।
অতীতটা এক আর্তনাদ।
দুঃসহ যন্ত্রনা, এক বিষাদময়তা
কষ্টের নোনা জল।

নন্দিনী

নন্দিনী, আমার ভালোবাসার নন্দিনী
হারিয়ে গেছি আমি তোমাতে।
তোমার বিচরণ আমার স্নায়ু তন্ত্রে
যেখানে সর্বদা উচ্ছল তুমি।
তুমি আমার পুজার ফুল
সে ফুলে গেঁথেছি মালা,
চাই মেটাতে আমার মনের জ্বালা।
কত সুন্দর করে বলেছিলে লাভ ইউ জান,
সে বলাতে নিবেদিত আমার মন প্রান।
আদরের উষ্ণ আবেশে হীম শীতল মনে
চিন্তায় মগ্ন থাকি শয়নে-স্বপনে।
চিলে কোঠায় আছ তুমি আমার অন্তরে

সেখান থেকে নিয়ে যাব তেপান্তরে।
চিৎকার করে বলব ভালবাসি জান
পাশের নদীতে ভাসাব আমাদের প্রেমের সাম্পান।

আপন ভাবনায় নন্দিনী

গোধূলী বেলায় মেঠো পথ ধরে হেটে যাচ্ছি
নেই কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনী।।
একা একা হেঁটে যাচ্ছি আর ভাবছি আনমনে
আমারো কেউ আছে, কে সে? সে আমার নন্দিনী।।
সুর্য্যটা ডুবু-ডুবু দুসর প্রান্তরে আমি একা
হৃদয়ের ছিপিটা খুলে দেখি এখন আর নেই ফাঁকা।।
দরজায় ছিটকিনি দিয়ে একান্ত ভাবনায়
আমার অবয়ব সামনে নিয়ে বসে আমার নন্দিনী।।
যাতে করে ভাবনায় ছেদ না ঘটে-উৎপাতে
কোন কাল নাগ বা নাগীনীর।।
সু-ললিত কণ্ঠে সুরের ঝংকার তুলে যায় আমার নন্দিনী
মুখ ফসকে বলে ফেলতে ইচ্ছে করে তুমি এখনি হয়ে যাও আমর ঘরনী।।
অনিন্দ-অসাধারণ এক হাসির জননী আমার নন্দিনী
তোমাকে সপে দিলাম আমার ভালবাসার সমস্ত রাগ রাগীনী।।

বর্নিল স্বপ্ন

কোন এক জোৎস্না রাতে
বর্নিল স্বপ্নেরা হানা দেয়।।
আলোর ঝলকানি, বাদ্যের তালে তালে
আচ্ছন্নতায় চলতে থাকি প্রমোদালয়ে।।
অপ্সরীর রূপ আর উন্নত বসনে
সুভাসিত চারিদিক আনন্দ জোয়ারে।।
খুঁজেচিনু তোমাকে হৃদয়ের নাচনে
আঁখি জোড়া থমকে যায় সিংহাসনে।।
রানীর মত বসে তুমি, হাসির রেখা টেনে
উন্নত বক্ষ যুগল ঠায় দাড়িয়ে,
মনে হল ডাকছ আমায় হাত দুটি বাড়িয়ে।।
নিকটে দাড়িয়ে খোলা বুকের হুক
উঠা নামার অপুর্ব ভঙ্গি সাথে দুক দুক,
ইচ্ছে করে স্পর্ষের উঞ্চতায় করি ছুক-ছুক।।
অপলক দৃষ্টি, কামনার আগুনে
ভিজিয়ে অঙ্গা ফিরেছি ফাগুনে।।

ভাবতে থাক!

দক্ষিনের জানালাটা খুলে উদাসী হও
ভাবতে থাক, কে ছিলাম আমি তোমার জীবনে।
কাজের ফাঁকে হঠাৎ থমকে যাও
ভাবতে থাক, কি ছিলাম আমি তোমার জন্য।
পথ চলতে চলতে আনমনা হও
ভাবতে থাক, কেন বিমুখ হয়েছি আমি।
ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চিন্তা মগ্ন হয়ে হও
ভাবতে থাক, কেন এমন হল তোমার পৃথিবী।
গভীর ঘুম থেকে আচমকা উঠে যাও

ভাবতে থাক, ভুলটা তোমার কোথায় ছিল।
বৈশাখী মেলার রং দেখে উন্দমী হও
ভাবতে থাক, শুধরে নিবে তোমার ভুল গুলো।।

একটু ভিন্ন রকম

চ্যার্ট রুম (০১)!

চ্যাটিং আর চিটিং
গোলমাল মিটিং।।
কবিতা আর গল্প
করি অল্প-অল্প।।
বক বক করে সব
শুধু শুধু কলরব।।
শৃংখলার নাম নেই
কারো কোন দাম নেই।।
আজ আমি খুলে দিব পান্ডোরার বাক্স
চ্যাট রুমের চল-চাতুরী কে কত দেখছ (?) ।।
এডমিন হব ভেবে দিন রাত চ্যাটিং
নিজের মধ্যে নিজে করি কত শত মিটিং।।
এডমিন হব আমি হবে আমার পাওয়ার
ইউজার দেখে আমায় করবে ইজ্জত নমস্কার।।
বন্ধু খুঁজতে এসে আমরা প্রপাগান্ডায় মেতে রই
অপরের ত্রুটি নিয়ে সারাক্ষন হৈ চৈ।।
ললনার চলনায় ভরা এই চ্যার্ট রুম
নূপুর গুলো বাজে তাদের রুম ঝুম রুম ঝুম।।
ঝংকার শুনে পাঘল কলি কালের হিমুরা
সম্বিৎ ফিরে পেলে মুখ হয় গোমরা।।
যাচাই বাছাই করে নাও আসল কিবা নকল
একটু সময় নাও পরে কর দখল।।
শিক্ষার অপচয় দিন ভর করছি
একটু দ্বন্ধ হলেই চ্যার্ট রুম খুলছি।।
মাস শেষে নেট বিল করে বিষন যন্ত্রনা
বিল দিতে দেরী হলে রেগে বলি খাবন।।
পৃথিবীটা আগের চেয়ে হয়ে গেল কত চেঞ্জ
চ্যার্ট রুমের উইন্ডোজ কে বলি ষ্টক এক্সচেঞ্জ।।
ভুলে গেছি অনেক কিছু পড়ে চ্যার্টেও পাল্লায়
চ্যার্ট রুমের রঙিন সময় নিশ্চিত যাবে গোল্লায়।।
মাইক আর কিক নিয়ে রিতিমত তোল পাড়
শালারে আমি খাইছি তুই আমারে ছাড়।।
অদৃশ্য থেকেও রেগে হন আগুন
এদিকে আমিতো হেসে হেসে হই খুন।।
সুন্দর আর সভ্যতায় গড় নিজের ভিত্তি
নিজের মধ্যে খুঁজে পাবে প্রত্যাশার প্রাপ্তি।।
ভুল যদি হয়ে যায় অজান্তে
ক্ষমা চাই সবার কাছে শেষান্তে।।

চ্যার্ট রুম (০২)!

সজনী কেন তুমি এই রুমে আগে আসনি (?)

পরে এসেও কেন তুমি আমায় ভালবাসনি (?)।।
জানু, মানু বলে সবাই যখন করল বাসি
আমার জানু হবে বল, আমি তখন হাসি।।
আগে আমি পি.এম করলে তুমি বলতে বিজি
এখন তুমি কথায়-কথায় আমাকে বোঝাতে চাও তুমি এখন ইজি।।
এখন আমার সময় নেই আমার আছে প্রিয়া
প্রিয়ার জন্য মাল গাঁথি জুই, চামেলী দিয়া।।
প্রিয়া যখন চলে যাবে আবার পাতবো জাল
কেউনা কেউ পড়বেই জালে যতই হোক সে বাচাল।।
প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে সারা ভুবনে
আবারো প্রেম করব আমি অতি গোপনে।।
কাকে ছেড়ে কাকে ধরি থাকি এই দ্বন্ধে
আগের মত হয়না কিছু ছন্দে আর আনন্দে।।
আমি কাউকে জানু বললে তুমি কর চিৎকার
দশ পোলার নাকে রশি লাগাও তুমি, আমি করি হাহাকার।।
সব পাখি মাছ খায় মাছ রাঙার নাম হয়
হাতে নাতে ধরা পড়লে অন্য পাখির হুশ হয়।।
পোলা গুলি এত বেকুম মাঝে মাঝে কষ্ট হয়
ললনাদের ছলনায় এরা পথ ভ্রষ্ট হয়।।
আলেয়াকে আলো ভেবে লম্প জম্প দিওনা
নিজের পায়ে কুড়াল খানা নিজে নিজে মেরোনা।।
পথ ভ্রষ্ট আছ যারা তাদের জন্য কামনা
হুশ আন ঠিকানায়, সময় আর পাবেনা।।

সাইফ মুন্না-বিভাগীয় সম্পাদক 'মরুপলাশ'।
রিয়াদ-সউদী আরব।

moru_tepantor@yahoo.com
saif.munna@gmail.com